শুক্রবার ■ ১ নভেম্বর, ২০২৪ ■ ১৬ কার্তিক ১৪৩১ ■ ২৮ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি ■ পাক্ষিক পত্রিকা ■ দাম: ৫ টাকা

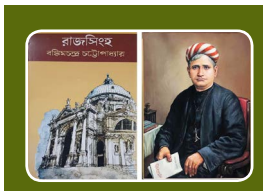

বইপড়া: বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ

শিক্ষা: প্রসঙ্গ: মাদ্রাসা শিক্ষা ও ভুতুড়ে শিক্ষক

পাক্ষিক সংবাদ-সাময়িকী
দৃষ্টি
ভিতরে বাইরে

অর্থনীতি: কৃষি অর্থনীতি ও দায়বদ্ধতার সমীকরণ

সমাজ: ও বি সি: ঘুম ভাঙছে না কিছুতেই

Vol: 1 ■ Issue: 6 ■ DRISHTI ■ 1 November 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ Fortnightly News Paper ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ Editor: Saifulla

এত বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কী হবে? পড়েই বা কী লাভ হচ্ছে?

মীর রেজাউল করিম

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত আটটা-নটা মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এখন তা বাড়তে বাড়তে ছত্রিশটায় উপনীত হয়েছে। গত দশ পনেরো বছরে সংখ্যাটা অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়েছে। কিন্তু কেন এই বৃদ্ধি। যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি তা কি পূর্ণ হয়েছে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া এমনিতে খুবই শ্রেয়। বাড়ির পান্তা ভাত খেয়ে কলেজের গণ্ডি অতিক্রম করা গেছে। কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় অনেক দূরে; মাস্টার ডিগ্রি করতে হলে সেখানে গিয়ে নিয়মিতভাবে থাকতে হবে, তার জন্য দরকার অনেক টাকা, যা অনেকের কাছেই নেই; কাজেই পড়াশুনার ইতি এখানেই। এসব ছিল তখনকার দিনে অতি পরিচিত বিষয়। এমন বাস্তবতার বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি; রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; যাতে শিক্ষার্থীরা একটু কষ্ট করে হলেও বাড়ি থেকে যাতায়াত করে মাস্টার ডিগ্রিটা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু সমস্যা হল, এই ইতিবাচকতা আজ সময়ের সাপেক্ষে এর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। আজ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি যেন ভারবহ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারও কারও ক্ষেত্রে হয়তো বা অভিশাপের রূপ নিচ্ছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই সব বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা কিসের জন্য; পুথিগত বিদ্যাচর্চার পরিসরকে যথাসম্ভব বাড়িয়ে নেওয়া এবং সেইসূত্রে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রথম বিশ্বের কোনো কোনো দেশের ক্ষেত্রে এর কম বেশি ব্যতিক্রম থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের সাপেক্ষে তার ব্যত্যয় নেই বললেই চলে। আমাদের মধ্যে খুব কম জনই নিছক ব্যক্তিগত সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি হাসিল করেন; অধিকাংশজনেরই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য থাকে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথকে প্রশস্ত করা। এদিকে এই সময়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের যা হালহকিকত তাতে এর মধ্যে দিয়ে কর্মজীবনের পথ প্রশস্ত হওয়া তো দূরের কথা, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই বেকারত্ব তৈরির কারখানা ঘরে পরিণত হয়েছে।

গত দশ বছরে রাজ্যে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সবই প্রায় প্রথাগত পঠন পাঠন ভিত্তিক অর্থাৎ কলা ও বিজ্ঞান শাখার বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সহ উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হয় এখান থেকে।

কিন্তু কথা হল, এই ডিগ্রি দিয়ে বা নিয়ে কী লাভ হচ্ছে। যারা ডিগ্রিপ্রাপ্ত হচ্ছে তাদের মুকুটে যে একটা পালক সংযুক্ত হচ্ছে তার অন্য নাম 'কাটবেকার'। এখন বছরে বছরে যে সংখ্যক পড়ুয়া স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করছে তার মধ্যে আশি থেকে নব্বই শতাংশ কর্মহীনতার শিকার। কেবল কলা বিভাগের সাপেক্ষে বিচার করলে সংখ্যাটা পঁচানব্বই থেকে নিরানব্বই শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে হয়তো। আগে এইসব পড়ুয়ারা যে পথ দিয়ে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেত সেই শিক্ষকতার দুয়ার প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ। আগের মতো নিয়মিত ব্যবধানে এস এস সি বা এম এস সি পরীক্ষা হওয়া; ওই পরীক্ষায় যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে সাবলীলভাবে নিয়োগপত্র হাতে পাওয়া; এসব এখন পড়ুয়াদের কাছে স্বপ্ন বললেও কম বলা হয়।

গত দশ বছরে সেভাবে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। যা দুই একবার নেওয়া হয়েছে তাও নিমজ্জিত হয়েছে দুর্নীতির চোরাবালিতে। সাদা খাতা জমা দেওয়ার পরেও স্বচ্ছ নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছে অনেকেই। এই অবস্থায় কীভাবে মনোবল ধরে রাখবে সাধারণ পড়ুয়ারা। হাজার ভাল পড়াশুনার পরেও চাকুরির পরীক্ষায় পাস করা যাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং পড়াশুনার সঙ্গে যার কোনোরকম সম্পর্ক নেই সে জায়গা পেয়ে যেতে পারে নিয়োগ-তালিকায়। পড়ুয়ারা তাই হতাশার গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। এদিকে যারা তার পরেও মন শক্ত করে নিজেকে প্রস্তুত রাখছে লড়াই এর জন্য, তাদের অপেক্ষার আর শেষ হচ্ছে না। এম এ, এম এস সি পাশ করেছে পাঁচ-সাত বছর হয়ে গেছে; এর মধ্যে এক বারের জন্যেও পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়নি, এমন পড়ুয়ার সংখ্যা হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ।

এই যদি অবস্থা হয়, তবে কেন এই পড়াশুনো, কেন এভাবে একটার পর একটা নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা! যদি এই সব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হত তবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পথ এমন সুগম হত না। সেক্ষেত্রে নিদারুণ বিনষ্টি থেকে রক্ষা পেত বেশ কিছু জীবন। তখন এম এ বা এম এস সি না করে পড়ুয়ারা কলেজ জীবন শেষ হওয়ার পরপরই প্রবেশ করতে পারতো কর্মজীবনে। সেই ইংরেজ শাসন থেকে মাস মাইনে কর্মজীবনের প্রতি বাঙালি যুবকদের যে দুর্নিবার আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল তার নিবৃত্তি হয়নি অদ্যাবধি। এই অবস্থায় বাড়ির কাছে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে দুর্নিবার ওই প্রবৃত্তিকে আরও দুর্বার করে তোলা; মরীচিকার পিছনে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া যুব সমাজকে। যদি ওই পথে উপযুক্ত কর্মস্থানের সুযোগ থাকতো তবে বিষয়টি অবশ্যই প্রশংসনীয় হত। কিন্তু তা যখন একেবারেই নেই তখন এভাবে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা আর প্রতারণার ফাঁদ পাতা একই কথা। আমাদের পড়ুয়া সমাজ এখন রাষ্ট্রশক্তির পাতা ফাঁদে আটকে পড়ে বিপন্ন।

এখন যা দিনকাল তাতে কর্মমুখী শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। তবে প্রথাগত পড়াশুনার বাইরে বার করে আনতে হবে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে। কর্মমুখী শিক্ষা প্রদান, কারিগরি শিক্ষার প্রসার নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মূল লক্ষ্য হওয়া দরকার। একটা সময় কর্মমুখী শিক্ষা বলতে মুখ্যত ইঞ্জিনিয়ারিংকে বোঝানো হত, এখন কর্মমুখী শিক্ষার সম্ভাবনা বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এই সম্ভাবনা-ক্ষেত্র বরাবর সম্প্রসারিত করে দিতে হবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা প্রশাখাকে। লক্ষ রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রাপ্ত হওয়ার পর কোনো পড়ুয়াকেই যেন বেকারত্বের তকমাধারী না হতে হয়। বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সিট সংখ্যা। অতিরিক্ত আসন সংখ্যা তৈরি করে বেকারত্বের বহরকে সম্প্রসারিত করার মতো মূর্খামি আর কিছুতেই করা যাবে না।

একটা সময় ছিল যখন অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতির মতো বিজ্ঞান-বিষয়ে পঠন পাঠন করা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করা ছিল চাকুরি পাওয়ার প্রায় সমার্থক। তখন এই সব বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করে কাউকেই বসে থাকতে হত না। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত সব বিষয়েও জায়মান বেকারের সংখ্যা শত শত নয়, সহস্র সহস্র।

এখন এ রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুব সমাজ সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষে বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হয়ে উঠেছে। সমাজের ছেলে বুড়ো সকলেই এখন তাদের দিকে করুণা মিশ্রিত দৃষ্টি বর্ষণ করে। হয়তো বা মনে মনে বলে—আহা বেচারী। কেবল মনে মনে কেন! মনের কথা অনেক সময় বাস্তবের মাটিতেও মুক্ত ছড়ায়—বন্ধু বা গুরুজন স্থানীয় কেউ হয়তো বা বলে বসে, লেখাপড়া শিখে কী করলি; ও পাড়ার অমুককে গিয়ে দেখে আয়: সোনার কাজ করে লাল হয়ে গিয়েছে।

যারা এভাবে বলেন, তাদেরকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। সত্যিই তো তারা অন্যায় কিছু বলছেন না; আমাদের সমাজে একজন এম এ বা এম এস সি পাস বেকার যুবকের পক্ষে ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য টিউশন করার অতিরিক্ত সম্মানজনক আর কোনো মাধ্যম নেই বললেই চলে। কিন্তু টিউশনিরও তো একটা সীমা আছে। শিক্ষিত বেকারদের সবাই যদি টিউশনের দিকে নজর দেয় তবে সেখানেও সংকট তৈরি হওয়া স্বাভাবিক এবং হাচ্ছেও তাই। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি: সুযোগ পেয়ে অভিভাবকরা একহাত নিতে উদ্যোগী হয়েছেন। মাসভর পড়ানোর পর প্রাপ্তিযোগ হচ্ছে মেরেকেটে দুই-তিন হাজার টাকা। এদিকে একজন কলের মিস্ত্রি, যে হয়তো এক ঘন্টা কাজ করে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে যাচ্ছে গৃহস্থ-ঘর থেকে। এই যদি অবস্থা হয় তবে শিক্ষিত বেকারের প্রতি অমন অমৃত বাণী বর্ষিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বেকারত্বের সমস্যা রয়েছে নিশ্চয়ই। তাই বলে আমরা উচ্চতর পড়াশুনা করা ও বিদ্যাচর্চা থেকে সরে আসবো। তাহলে তো সমস্তটাই অন্ধকার হয়ে যাবে; অদুর ভবিষ্যতে এই অন্ধকার ভেদ করে আলোর পথে উপনীত হওয়া মোটেই সহজ হবে না। কথাটা ঠিক। আবার এই কথাও ঠিক যে, নিঃসীম বেকারত্ব যদি শিক্ষিত যুব সমাজের অনিবার্য ভবিতব্য হয় তবে আগামীতে যে ভয়াবহ অন্ধকার সমাজ-মনকে আচ্ছন্ন করবে তার থেকে মুক্তি পাওয়া সহস্র গুণ কঠিন হবে। তার থেকে বরং অনেক বেশি শ্রেয় প্রথাগত পড়াশুনার বহর কমবেশি সঙ্কুচিত করে যুবসমাজকে সম্মানজনক কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। আমাদের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রকে এখন এমন ভাবে বিন্যস্ত করা জরুরি যাতে বিশেষ মেধা সম্পন্ন ছাড়া অন্য পড়ুয়ারা উচ্চশিক্ষার উঠোনে পা রাখতে না পারে। মেধার মাত্রা অনুসারে কেউ কেউ স্নাতক, কেউ বা উচ্চমাধ্যমিকের পরে প্রথাগত পড়াশুনা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ নিশ্চয়ই শিক্ষকতা, অধ্যাপনা বা গবেষণার লক্ষ্য নিয়ে পড়াশুনা করবেন। তারও সুবন্দোবস্ত করতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, এক্ষেত্রে সংখ্যাটা যেন কিছুতেই সীমা না ছাড়ায়।

পড়াশুনা বা বিদ্যাচর্চা করার পথ এখন একক ও একমুখী নয়। নানা পথ রয়েছে। সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজের মতো করে যে কেউ তার পড়াশুনার পরিসরকে বাড়িয়ে নিতেই পারেন। আবার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার পথও উন্মুক্ত রয়েছে মুক্তবিশ্ববিদ্যালয় বা দূরশিক্ষার সূত্রে। এখন আমাদের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা দূরশিক্ষার দরজাকে এমন ভাবে উন্মুক্ত রাখতে হবে যাতে যে কোনো পেশার সঙ্গে যুক্ত যে কোনো বয়সের পড়ুয়ার পক্ষে কোনো রকম সমস্যা না হয়। স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সহ পি এইচ ডি পর্যন্ত সম্ভাব্য সব রকমের শংসাপত্র অর্জন করার পথ সুগম থাকে।

আমাদের কথা

বর্ষ-১ ■ সংখ্যা-৬ ■ ১৬ কার্তিক ১৪৩১ ■ ২৮ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

নিজেকে হেফাজত করা এখন সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য

এমনিতেই জীবনের কোনো স্থায়িত্ব নেই। আজ বেঁচে আছি বটে, কিন্তু কাল যে বেঁচে থাকা যাবে তা নিশ্চিত করে বলার কোনো উপায় নেই। যে কাউকে যে কোনো মুহূর্তে ঝরে যেতে হতে পারে জীবনের বৃন্ত থেকে মৃত্যুর হিমশীতল গভীরে। অর্থাৎ চূড়ান্ত এক অনিশ্চয়তার সঙ্গে সতত সহবাস করতে হয় জীব মাত্রকে। জীবন মৃত্যুর সঙ্গে সমঝোতা করে এমনি করে কেউ কেউ টিকে থাকেন শত বছর বা তারও বেশি; আবার কাউকে কাউকে চলে যেতে হয় একান্ত অকালে। এই অকালে চলে যাওয়াটা একদিকে যেমন পরম বেদনাদায়ক অন্যদিকে তেমনি চূড়ান্ত ক্ষতিরও কারণ। একজন মানুষের অকাল প্রয়াণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পরিবার ও সমাজ। এক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষতির বহর এত ব্যাপ্ত ও প্রকট যে তা নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার আবশ্যকতা থাকে না; তবে সামাজিক ক্ষয় ক্ষতি নিয়ে দু'চার কথা বলার সুযোগ তো রয়েছেই।

নিশ্চয়ই সব মানুষ তার সমাজের কাছে সমানভাবে প্রয়োজনীয় নয়। কারও কারও সামাজিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অন্য অনেকের থেকে অনেক বেশি। এই সব মানুষের দিক থেকে পরিষেবা পাওয়া না পাওয়ার উপর নির্ভর করে সামাজিক ভালো মন্দের অনেক কিছু। তাঁদের সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে বর্তমান থাকা তাই খুবই জরুরি। এদিকে এই বেঁচে থাকার পথে রয়েছে হাজারও বাধা।

আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। তারপরেও কিন্তু কোনো মুক্তি নেই। আজও এমন কিছু ব্যাধি রয়ে গেছে যা নিরাময় হওয়ার নয়। আজ অথবা কাল ওই ব্যাধি তাকে মৃত্যুর দুয়ারে এনে দাঁড় করাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আমাদের অসহায়তাই শেষ কথা এবং তার পরও যা কিছু কথা থেকে যায় তার ভারও কিন্তু কম নয়। এই যেমন ব্যক্তি বিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ, রাজনৈতিক বিদ্বেষের প্রেক্ষিতে সংঘটিত অগণিত মৃত্যু।

একটা সময়ে জাতি বিদ্বেষের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল; জাতি বিদ্বেষের গাঢ় রঙে রঞ্জিত ছিল আমাদের মধ্যেকার অনেকেরই মনের পর্দা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমতাসীন এক একটা জাতি কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতির জীবন হরণ করা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক বিষয়। তারপর ক্রমে ক্রমে অবস্থার উন্নতি হয় কতকাংশে। জাতি-বিদ্বেষের দাবানল থেকে কিছুটা হলেও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হই আমরা। তবে তারপরেও স্বস্তি মেলেনি কিছুতেই। জাতি বিদ্বেষের আগুন স্তিমিত হতে না হতে চারদিক থেকে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক আরও কত সব কিসিমের আগুন। এতে করে সতত ধ্বস্ত হওয়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের অনিবার্য ভবিতব্য। এই ভবিতব্যকে অস্বীকার করা তো দূরের কথা, প্রতিহত করাও অসম্ভব প্রায়। এই যেমন আকলাখ বা জুনাইদদের বৃত্তান্ত।

গো মাংস ভোজন করা অন্যায়? না অন্যায় নয়? অন্যায় হলে তার পরিমাণ কতটা এবং তার জন্য কী পরিমাণ শাস্তি প্রাপ্য— এসব প্রশ্নকে আপাতত চালের বাতায় গুজে রাখা হল। কিন্তু যে প্রশ্নটা না করলেই নয় তা হলো, আদতে কি সেদিন আকলাখ গো মাংস ভক্ষণ করেছিল; তার বাড়িতে কি গো মাংসের কোনো অস্তিত্ব ছিল। এখনও পর্যন্ত এর পক্ষে কোনো তথ্য প্রমাণ প্রতিপন্ন করা হয়নি। অর্থাৎ আকলাখ সেদিন গো মাংস ভক্ষণ করেনি। তবু তাকে গো মাংস ভক্ষণের অপরাধে মরতে হয়েছিল। একই কথা প্রযোজ্য অন্য অনেকের মতো জুনাইদের ক্ষেত্রেও। তখনো কৈশোরের সীমা পেরিয়ে যৌবনের উঠানে পা রাখেনি ছেলেটা। এমন একটি ছেলে যে সদ্য আল কুরআন এর হাফেজ হতে পারার আনন্দে প্রজ্জ্বল, সে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে এমন কি অন্যায় করতে পারে যার জন্য ওভাবে মারা হবে। নিদারুণভাবে মরতে হবে তাকে।

আসলে এখন এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে, মারাটাই লক্ষ্য। যাকে মারতে চাই তাকে আমার আকাঙ্ক্ষার আগুনে আত্মাহুতি দিতেই হবে; বিষয়টি সম্পূর্ণত কারণ বা না কারণ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ ন্যূনতম কোনো কারণ থাকারও আবশ্যকতা নেই। আমার বা আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছাই তোমার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট কারণ নয় কী! নিশ্চয়ই। আমি চাইছি, আমরা চাইছি; অতএব তোমাকে মরতে হবে। এর মাঝে আর কোনো কথা নেই; থাকতে পারে না। একটা সময় ছিল, যখন সামাজিক প্রভুরা কেমন করে একটা মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে শেষাবধি মৃত্যুর গভীরে তলিয়ে যায় তা তারিয়ে তারিয়ে হরণ করে দিনের স্বস্তি ও রাতের নিদ্রাকে। অস্বাভাবিক এক যন্ত্রণা বোধে তাড়িত হতে হয় সতত। জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করে প্রতিবাদের আগুনে। যেন মনে হয় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিই সব কিছু।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করা পরম কর্তব্য। মানুষ মাত্রই কমবেশি এই কর্তব্য-ভার বহন করেন। ফলত এক্ষেত্রে প্রতিবাদী হতে চাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু না; অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে প্রতিবাদীও হওয়া যাবে না সেভাবে। তেমন হলে নিজেকেই প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে এনে দাঁড় করানো হবে।

গো মাংস ভোজন করা অন্যায় না অন্যায় নয়; অন্যায় হলে তার পরিমাণ কতটা এবং তার জন্য কী পরিমাণ শাস্তি প্রাপ্য- এসব প্রশ্নকে আপাতত চালের বাতায় গুজে রাখা হল। কিন্তু যে প্রশ্নটা না করলেই নয় তা হলো, আদতে কি সেদিন আকলাখ গো মাংস ভক্ষণ করেছিল; তার বাড়িতে কি গো মাংসের কোনো অস্তিত্ব ছিল। এখনও পর্যন্ত এর পক্ষে কোনো তথ্য প্রমাণ প্রতিপন্ন করা হয়নি। অর্থাৎ আকলাখ সেদিন গো মাংস ভক্ষণ করেনি। তবু তাকে গো মাংস ভক্ষণের অপরাধে মরতে হয়েছিল। একই কথা প্রযোজ্য অন্য অনেকের মতো জুনাইদের ক্ষেত্রেও। তখনো কৈশোরের সীমা পেরিয়ে যৌবনের উঠানে পা রাখেনি ছেলেটা। এমন একটি ছেলে যে সদ্য আল কুরআন এর হাফেজ হতে পারার আনন্দে প্রজ্জ্বল, সে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে এমন কি অন্যায় করতে পারে যার জন্য ওভাবে মারা হবে। নিদারুণভাবে মরতে হবে তাকে।

আসলে এখন এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে, মারাটাই লক্ষ্য। যাকে মারতে চাই তাকে আমার আকাঙ্ক্ষার আগুনে আত্মাহুতি দিতেই হবে; বিষয়টি সম্পূর্ণত কারণ বা না কারণ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ ন্যূনতম কোনো কারণ থাকারও আবশ্যকতা নেই। আমার বা আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছাই তোমার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট কারণ নয় কী! নিশ্চয়ই। আমি চাইছি, আমরা চাইছি; অতএব তোমাকে মরতে হবে। এর মাঝে আর কোনো কথা নেই; থাকতে পারে না।

বাতায় গুজে রাখা হল। কিন্তু যে প্রশ্নটা না করলেই নয় তা হলো, আদতে কি সেদিন আকলাখ গো মাংস ভক্ষণ করেছিল; তার বাড়িতে কি গো মাংসের কোনো অস্তিত্ব ছিল। এখনও পর্যন্ত এর পক্ষে কোনো তথ্য প্রমাণ প্রতিপন্ন করা হয়নি। অর্থাৎ আকলাখ সেদিন গো মাংস ভক্ষণ করেনি। তবু তাকে গো মাংস ভক্ষণের অপরাধে মরতে হয়েছিল। একই কথা প্রযোজ্য অন্য অনেকের মতো জুনাইদের ক্ষেত্রেও। তখনো কৈশোরের সীমা পেরিয়ে যৌবনের উঠানে পা রাখেনি ছেলেটা। এমন একটি ছেলে যে সদ্য আল কুরআন এর হাফেজ হতে পারার আনন্দে প্রজ্জ্বল, সে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে এমন কি অন্যায় করতে পারে যার জন্য ওভাবে মারা হবে। নিদারুণভাবে মরতে হবে তাকে। আসলে এখন এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে, মারাটাই লক্ষ্য। যাকে মারতে চাই তাকে আমার আকাঙ্ক্ষার আগুনে আত্মাহুতি দিতেই হবে; বিষয়টি সম্পূর্ণত কারণ বা না কারণ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ ন্যূনতম কোনো কারণ থাকারও আবশ্যকতা নেই। আমার বা আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছাই তোমার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট কারণ নয় কী! নিশ্চয়ই। আমি চাইছি, আমরা চাইছি; অতএব তোমাকে মরতে হবে। এর মাঝে আর কোনো কথা নেই; থাকতে পারে না।

একটা সময় ছিল, যখন সামাজিক প্রভুরা কেমন করে একটা মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে শেষাবধি মৃত্যুর গভীরে তলিয়ে যায় তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জন্য একটার পর একটা মানুষকে হিংস্র পশুর মুখে ঠেলে দিত; বা আর কোনো পথে তাদের মৃত্যুকে ডেকে আনতো। কিন্তু এখন আর এসব হওয়ার কথা নয়। তবুও তা হচ্ছে; হয়তো বা আরও মারাত্মক রূপে। মারাত্মক রূপে এই কারণে যে, দাসপ্রথা বা অনুরূপ ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রতিপালিত মানুষ দেহ মনে প্রস্তুত হয়েই থাকতো, যে কোনো পরিস্থিতির জন্য। কিন্তু এখন তো তা হওয়ার নয়। এখন ব্যক্তিমাত্রের ব্যক্তিক ও সামাজিক অধিকার সর্বতোভাবে স্বীকৃত। আমাদের ভারতীয় সংবিধান অন্তত এ ব্যাপারে আপোষহীন অবস্থানে স্থিত। এখানে নাগরিক মাত্রের জান-মালের নিরাপত্তার দায় স্বীকার করা হয়েছে সম্পূর্ণত। তবু তারপরেও বিনা অপরাধে মরতে হচ্ছে আকলাখ ও তার ধর্ম ভাইদের। বিষয়টি গভীর, ভাবাত্মক। ভাবনার গভীরতা আসলে প্রতিবাদের ধারণা তখনই সত্য যখন তা ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। আর এখানেই হয়েছে সমস্যা। আকলাখদের অন্যায় মৃত্যুর দায় স্বীকার করা তো দূরের কথা, আজকের রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকারীরা তার জন্য সামান্য সমবেদনা প্রকাশ করতেও নিতান্ত নারাজ। বরং সমবেদনা প্রদর্শনকারীদেরই অত্যন্ত না পছন্দ করছেন তারা। এমন অবস্থায় নিজেকে হেফাজত করার অতিরিক্ত আর কীই বা করার থাকতে পারে সাধারণের পক্ষে। বিশেষত আকলাখের সমাজের মানুষ জনের দিক থেকে। তাদেরকে এখন প্রতিটি পা ফেলতে হবে অত্যন্ত হিসেব নিকেশ করে। মনে রাখতে হবে, হিসেবের সামান্য ভুল হলেই কিন্তু চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। তাই কোনো রকম প্ররোচনায় পা দেওয়া তো দূরের কথা; প্ররোচনা তৈরি সামান্য সম্ভাবনা থেকেও নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকতে হবে। সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ চাইলে সবটা করে ফেলতে পারে না; বুদ্ধি বৃত্তিকতার পাশাপাশি মন নামের এক সক্রিয় শক্তিও মানুষকে গভীর ভাবে চালনা করে। অনেক ক্ষেত্রে এই চলমানতাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয় না। ফলত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এমন অবস্থাতেও যতদূর সম্ভব নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে। কথায় বলে, সর্বনাশের অর্ধেক ভালো। এই প্রবাদ বাক্যকেই এখন আপ্ত বাক্যের মতো করে গ্রহণ করতে হবে। সংঘটিত কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আর কোনো অন্যায় সংঘটিত হওয়ার পটভূমি প্রস্তুত করা থেকে বিরত থাকতে হবে সর্বতোভাবে। তবে তার অর্থ এই নয়, অন্যায়কেই শেষ সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হবে। নিশ্চই তা করা যাবে না। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিবিধানের পথে পা রাখতেই হবে কোনো না কোনো দিন। আসলে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই যে, সেই দিনটা আজ না কাল। আমাদের মতে কাল।

প্রকৃতি তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সব অন্যায়ের নিরসন করে যথাসময়ে এবং উপযুক্তভাবে। পাশাপাশি এ ব্যাপারে প্রত্যেক জাতি-সংস্কৃতির একটা নিজস্বতা আছে এবং আমরা ভারতীয়রা এই নিজস্বতার সাপেক্ষে অনন্য অবস্থানে স্থিত রয়েছি। আজ যে পরাশক্তি নিজেদেরকে অপরাজেয় বলে মনে করছে ভারতেতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই একটু অপেক্ষা করাই শ্রেয়। ভারত ভূমিতে অসত্য বা অশুভ শক্তি কখনোই শেষাবধি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। প্রত্যেকেরই পতন হয়েছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো কারণ নেই: ব্যতিক্রম হবে না। আমাদের ভুল পদক্ষেপ এক্ষেত্রে আগামী সূর্যোদয়ের সম্ভাবনাকে প্রলম্বিত করতে পারে মাত্র। তাই সাবধান থাকা; ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা উপযুক্ত সময়ের জন্য।

অশনি সংকেত

জনসংখ্যাবৃদ্ধি হারে আঞ্চলিক বিভিন্নতা

জনসংখ্যা-তত্ত্ব অনুযায়ী একটা দেশ কোনো বিশেষ সময়ে চারটি পর্যায়ের কোনো একটিতে অবস্থান করে এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় অতিক্রম করে একটার পর একটা পর্যায়। এটা নির্ভর করে দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সূচক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। প্রথম পর্যায়ে জন্ম হার যেমন বেশি থাকে মৃত্যু হারও তেমনি থাকে বেশি। এটি সাধারণত অত্যন্ত অনুন্নত দেশ বা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে মৃত্যুহার কমে এবং জন্মহার তুলনায় বেশি থাকে বলে সামগ্রিক ভাবে জন সংখ্যা বাড়ে। তৃতীয় পর্যায়ে জন্ম হার এবং মৃত্যু হার উভয়ই কমে। এই পর্যায়েও সামগ্রিক ভাবে জন সংখ্যা বাড়ে, তবে তুলনায় অনেক ধীর গতিতে। চতুর্থ পর্যায়ে জন্ম হার অত্যাধিক কমে যায় এবং মৃত্যু হার একই থাকে, ফলত দেশের জন সংখ্যা কমতে থাকে।

ভারতে ১৮৮১ সাল থেকে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে প্রতি দশ বছর অন্তর। এই আদমশুমারি থেকে একদিকে যেমন দেশের মোট জন সংখ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি অঞ্চল ভিত্তিক (রাজ্য, জেলা তহসিল প্রভৃতি) জন সংখ্যার পরিসংখ্যানও পাওয়া যাচ্ছে। আর সেখান থেকেই প্রতীয়মান হচ্ছে এমন কিছু বিষয় যা খুবই উদ্বেগজনক।

প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে ভারতের জন সংখ্যা ছিল ৩৪৫ মিলিয়নের মতো। ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম আদমশুমারি হয় এবং তা থেকে দেখা যায় বর্তমান জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬১ মিলিয়ন। ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে ১.২৫ শতাংশ ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৫১ সাল একটি টার্নিং পয়েন্ট। এই আদমশুমারি থেকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতঃপর তা বাড়তে বাড়তে ২০০১ এর মধ্যে তিন গুণে পরিণত হয়েছে। ১৯৬১-১৯৭১ সালে এদেশে বার্ষিক জন সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ, যা ২.২২ শতাংশ। ১৯৭১ সাল পরবর্তী চার দশকে এই বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ২ শতাংশ। এই সময়কালকে বলা যেতে পারে দ্বিতীয় পর্যায় (জনসংখ্যা বিস্ফোরণ পর্যায়)। এর পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। (১৯৯১-২০০১ সালে ১.৯৫ শতাংশ থেকে ২০০১-২০১১ তে ১.৬২ শতাংশ) জাতিসংঘের ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ভারতের জনসংখ্যা পরবর্তী ৭-৮ বছরে চীনকে ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০৬১ সাল পর্যন্ত তা বাড়তে বাড়তে ১, ৬৫০ মিলিয়নে পৌঁছবে। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে যা বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন ভারতের জনসংখ্যা ১৪২.৮৬ কোটি; চীনের ১৪২.৫৭ কোটি।

উল্লেখ্য, এই বৃদ্ধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাৎপর্যপূর্ণ নানা দিক থেকে। তবে এসব তাৎপর্যের সবটা আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা বিশেষ করে নজর দিতে চাইছি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে যে আঞ্চলিক বৈপরীত্য লক্ষ করা যাচ্ছে তার দিকে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হারে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, কিন্তু দেশের সর্বত্র তা সমান ভাবে কার্যকর হয়নি। আদমশুমারি তথ্য থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে, উত্তর ভারতের রাজ্য গুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক বেশি। ১৯৭১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে রাজস্থান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাট রাজ্যের সম্মিলিত জনসংখ্যা গড়ে ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপরীতে, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটকের মতো দক্ষিণের রাজ্যগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্রা ১০০ শতাংশ বা তারও কম।

জনসংখ্যা তত্ত্বে টোটাল ফার্টিলিটি রেট বলে একটি সূচক আছে। এর অর্থ একজন মহিলা তার জীবদ্দশায় কতজন সন্তানের জন্ম দেয়। টি এফ আর ২.১ হলে কোন দেশের জনসংখ্যা স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছায়। উল্লেখ্য, ভারতের বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডে এখনো এই সূচক জাতীয় গড় ও স্থিতিশীল অবস্থার থেকে বেশ বেশি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের দিক থেকে দেশের মধ্যে অঞ্চল ভেদে বা রাজ্য ভিত্তিক এই যে বৈষম্য তৈরি হয়েছে তার প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে বাধ্য। জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনায় কম হওয়ায় দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী অর্থাৎ বয়স্ক মানুষের আনুপাতিক হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। এতে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অধীনে আনতে হবে আরও অনেক মানুষকে। এর ফলে, এই প্রকল্পে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং সামগ্রিকভাবে চাপ বাড়বে সরকারের উপর। সমস্যা তৈরি হবে অন্য দিক থেকেও। প্রত্যক্ষ উৎপাদন বা পরিষেবা প্রদান, যে কোনো দিক থেকে দেখা হোক না কেন, শ্রমশক্তি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই শ্রম শক্তির উৎস যুব সমাজ। যুব সমাজের সংখ্যা কমতে থাকলে উৎপাদন ব্যবস্থায় তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তখন অন্য জায়গা থেকে শ্রম শক্তি আমদানি করতে হবে। এতে সামাজিক ভারসাম্যের সমস্যা মাথাচাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা প্রকট। উৎপাদক সংস্থা চাইবে যত সস্তায় সম্ভব শ্রম পেতে। এদিকে এই সস্তা শ্রম স্থানীয়দের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় তারা এর বিরোধিতা শুরু করবে। ফলত সামাজিক সংঘাত সৃষ্টি হওয়া হবে শুধু সময়ের অপেক্ষা। প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতে কিছু কাল যাবত যা লক্ষ করা যাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। আরও গভীর সব সঙ্কটের মোকাবিলাও করতে হবে অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের রাজ্যগুলিকে। জাতীয় বাজেটে অঞ্চল ভিত্তিতে ব্যয় বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে জন সংখ্যা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে মান্যতা পায়। সেক্ষেত্রে জনসংখ্যা সাপেক্ষে দেশের কেন্দ্রীয় বাজেটের অধিকাংশ শোষণ করে নেবে উত্তর ভারতের হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলি। এই সব রাজ্যের জনসংখ্যা তুলনায় বেশি। তাই তাদের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবি সহজেই মান্যতা পেয়ে যাবে। আর এই অতিরিক্ত অর্থ ওই সব অঞ্চলের অর্থনৈতিক মানচিত্রকে দ্রুত বদলে দেবে। প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগান স্বতঃস্ফূর্ত রয়েছে। এর সঙ্গে অর্থের সরবরাহ সাবলীল হলে অর্থনীতিতে বসন্ত আসা খুবই স্বাভাবিক। অন্য রাজ্যের অধিবাসীরা এমন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে অগ্রগতির পথে ক্রমশ পিছিয়ে পড়বে।

তবে এহ বাহ্য। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সমস্যা দেখা দেবে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে। আমাদের দেশের মতো সংসদীয় রাজনীতিতে লোকসভায় বা কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভায় যে রাজ্যের সদস্য সংখ্যা যত বেশি থাকবে তারা জাতীয় ক্ষেত্রে তত কর্তৃত্ব দেখাতে পারবে। এবং এখানেই সমস্যা সীমা ছাড়াবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো আমাদের দেশের সংসদে রাজ্য ভিত্তিক আসন সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়। সময়ে সময়ে তা পরিবর্তন যোগ্য। আর এই পরিবর্তনের প্রধান পরিমাপক হল জনগণ তথা ভোটারের সংখ্যা। যে রাজ্যে ভোটারের সংখ্যা যত বেশি হবে তাদের প্রাপ্য সিটও তত বাড়বে। এতে পিছিয়ে পড়বে অন্য রাজ্য সমূহ।

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যগুলির বিধানসভা ও লোকসভার আসন সংখ্যা প্রতি দশ বছর অন্তর পরিবর্তন হওয়ার কথা। যদিও ১৯৭৬ সালের জরুরি অবস্থার পর থেকে বিষয়টি স্থগিত আছে। কিন্তু চিরদিনই তো স্থগিত থাকবে না। ২০২৫ সালেই জনসংখ্যা ভিত্তিতে ২০২৮ সালে আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের জনসংখ্যা ২০১১ থেকে ২০৩৬ সালের মধ্যে ৩১.১ কোটি বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এদিকে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং গুজরাটের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে এই বৃদ্ধির হার ৬৩.৮ শতাংশে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এর ফলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি ২৬ টি সাংসদ-আসন হারাতে পারে। উল্টোদিকে কেবল বিহার ও উত্তরপ্রদেশই বৃদ্ধি পেতে পারে ২১ টি আসন।

ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ; যা আমাদের পরম গর্বের।

জাতীয়তা

আমাদের দেশে প্রচলিত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সংসদীয় গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখা বা বজায় থাকা খুবই প্রয়োজনীয়। এটা না হলে ভেঙে পড়তে পারে পুরো পরিকাঠামোটাই। আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে আঞ্চলিক বঞ্চনা ও বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করে তার প্রতিবিধান করতে হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের আঞ্চলিক বৈষম্য এই প্রতিবিধান প্রয়াসকে অনতিক্রম্য প্রায় প্রশ্ন চিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করাতে পারে। নাড়িয়ে দিতে পারে দেশের স্থায়ীত্বের ভিত্তি। তাই এখনই সচেতন হওয়া ও কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ জরুরি।

আমরা বিশেষ করে নজর দিতে চাইছি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে যে আঞ্চলিক বৈপরীত্য লক্ষ করা যাচ্ছে তার দিকে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হারে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, কিন্তু দেশের সর্বত্র তা সমান ভাবে কার্যকর হয়নি। আদমশুমারি তথ্য থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে, উত্তর ভারতের রাজ্য গুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক বেশি। ১৯৭১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে রাজস্থান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাট রাজ্যের জনসংখ্যা গড়ে ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপরীতে, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটকের মতো দক্ষিণের রাজ্যগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্রা ১০০ শতাংশ বা তারও কম।

আনোয়ার সাদাত হালদার

সহকারী অধ্যাপক, সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

কৃষি অর্থনীতি ও দায়বদ্ধতার সমীকরণ

তড়িৎচুম্বক স্বাভাবিক নিয়মেই লৌহচূর্ণকে আকর্ষণ করে। আর সব দিক অনুকূল হলে, তড়িৎচুম্বকের চারপাশে ধীরে ধীরে লৌহচূর্ণের স্তূপ বাড়তে থাকে। এতে তড়িৎচুম্বকটি আরও শক্তিশালী হয়ে আরও বেশি পরিমাণ লৌহচূর্ণকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। সম্পদশালী ব্যক্তিরাও ঠিক তেমনি। অপেক্ষাকৃত কম সম্পদশালীদের কাছ থেকে সম্পদ শুষে নিয়ে ক্রমান্বয়ে অপরিসীম সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠেন তারা। অর্থাৎ সম্পদ-স্রোতকে এর নিজস্ব নিয়মে প্রবাহিত হতে দিলে ধনী আরও ধনী হবে, গরিব হবে আরও গরিব। তাই সম্পদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দরকার। আর এই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ হবে পক্ষপাতহীন। হৃৎপিন্ড যেমন নিরপেক্ষ ভাবে শরীরের সর্বত্র সমানভাবে রক্ত সঞ্চার করে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা তেমনি দেশ নামক শরীরের সকল অংশে প্রয়োজন মাফিক সম্পদের বিরামহীন চলাচলকে নিশ্চিত করবে। কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে এর সম্পূর্ণ উল্টো। এখানে নিরপেক্ষতা বজায় থাকছে না একেবারেই। রাষ্ট্রশক্তি দিনে দিনে আরও পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে পড়ছে এবং এই পক্ষপাত সর্বদা সম্পদশালীদের অনুকূলেই বইছে। ফলত ধনী দরিদ্রের মধ্যেকার ব্যবধান দিনে দিনে বাড়ছে; দেশের আর্থিক অসুস্থতা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

আজকের বাজার অর্থনীতিতে অর্থই হল প্রথম ও প্রধান কথা। অর্থ আসে দুটি উৎস থেকে— উৎপাদন এবং পরিষেবা। তবে উৎপাদনই হল অর্থনীতির মেরুদণ্ড। পরিষেবা উৎপাদনের উপরেই নির্ভরশীল। পরিষেবা উৎপাদনের বন্টন, উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিষেবা অর্থনীতিকে বাইরে থেকে চাকচিক্যময় করে মাত্র। পরিষেবা কোনো দেশের আর্থিক ভারকে সম্পূর্ণত ধারণ করতে পারে না। যে দেশ যথেষ্ট মাত্রায় পরিষেবা অন্য দেশে রপ্তানি করতে পারে, কেবলমাত্র সে দেশই এর উপর কিছুটা নির্ভরশীল হতে পারে। আমাদের দেশ পরিষেবা রপ্তানিকারক নয় সেভাবে: উৎপাদনই তাই আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

মুহম্মদ আফসার আলী
অধ্যক্ষ, খুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ, কলকাতা

উৎপাদন দুই ধরনের কৃষিভিত্তিক ও কারখানাভিত্তিক। প্রথমটির সঙ্গে সাধারণত গ্রামের গরিব মানুষেরা সংযুক্ত থাকেন; যারা আধুনিক সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা ও সরকারের সুনজর থেকে বঞ্চিত। তারা শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক সক্ষমতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা-বঞ্চিত হওয়ার কারণে শক্তিশালী রাজনৈতিক লবি তৈরি করতে পারেন না। এতে রাষ্ট্রশক্তি বা সরকারের কাছেও তারা তেমন গুরুত্ব পান না। অপর পক্ষে, অর্থশালী ও প্রভাবশালী শিক্ষিত, সচেতন, শহরে লোকেরা শিল্প উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণকে পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে সরকার শিল্পপতিদের স্বার্থকে অস্বীকার করতে পারেন না। যে দলই সরকার গঠন করুন না কেন তারা শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেন। কৃষিক্ষেত্র তাই বরাবরই অবহেলিত থেকে যায়। অথচ শিল্প উৎপাদনের চেয়ে কৃষি উৎপাদন আমাদের অস্তিত্বের জন্য অনেক বেশি জরুরি। জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য যে খাদ্য তা কৃষি থেকেই আসে। শিল্পপতিরাও কৃষিক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত সামগ্রী ভক্ষণ করে বেঁচে থাকেন। শিল্প জাত দ্রব্য ছাড়াও জীবন বয়ে চলতে পারে অবলীলায়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলে এসেছে। ভারি শিল্প বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা তো এই সেদিনের বিষয়। মাত্র কয়েক শত বছর এর ব্যাপ্তি কাল। এর আগে ভারিশিল্পজাত দ্রব্যের পরিষেবা ব্যতিরেক জীবনের স্রোত প্রবাহিত হওয়াতে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। মানুষ সহ সম্পূর্ণ জীব জগতের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কৃষি উৎপাদনের আজও কোনো বিকল্প নেই।

কৃষিক্ষেত্রকে, সেই সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত কৃষকদের সমস্যাকে তাই অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

কিন্তু অগ্রাধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, পদে পদে পদদলিত করা হচ্ছে কৃষকদের। এখন কৃষকদের দূরবস্থার শেষ নেই। তারা চাষ করে বটে, কিন্তু চাষ করতে যে জমি লাগে সেই জমির উপর মালিকানা তাদের নেই বললেই চলে। দেশের চাষযোগ্য জমির ৯৪ শতাংশ ১৫ শতাংশ উচ্চবর্ণীয় ক্ষমতাশীল মানুষদের হাতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই ১৫ শতাংশ মানুষের কেউই সেই অর্থে কৃষক নয়; তারা জমিতে পা দেন না; হাতে কলমে লাঙল ধরা বা ধান কাটার তো প্রশ্নই ওঠে না। তারা কেবলই জমির মালিক। মালিকানাভুক্ত জমি কৃষকদের কাছে নিদিষ্ট শর্তে ভাড়া দেয় তারা। কৃষকরা বাধ্য হয়, কঠিন সব শর্তসাপেক্ষে তাদের থেকে জমি সংগ্রহ করে তাতে ফসল ফলাতে।

এখন চাষ আবাদ করার জন্য খরচ হয় যথেষ্ট মাত্রায়। গরিব কৃষকদের এই খরচ করার সামর্থ্য নেই। তারা ব্যাঙ্ক থেকে কৃষিঋণ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। এদিকে ব্যাঙ্ক ঋণ দেয় না। অভিযোগ এই যে. কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। ব্যাঙ্ক বলে, তারা তাকেই ঋণ দেবেন যাদের পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে। এতে কৃষকরা বাধ্য হয় সুদখোর বানিয়াদের শরণাপন্ন হতে। এই বানিয়ারা রক্তশোষক পশুর থেকেও মারাত্মক। এরা বাৎসরিক ১২০ শতাংশ সুদের হারে ঋণ দেয়। তারপর তা আদায় করার জন্য কৃষকদের গলায় গামছা চড়ায়। এতে কৃষকদের দুরবস্থার একশেষ হয়। তারা আজীবন বাঁধা পড়ে যায় বানিয়াদের পাতা ফাঁদে।

আমাদের দেশে কৃষি উৎপাদন এখনও মুখ্যত প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতি বিমুখ হলে তো কথাই নেই। প্রকৃতির সদয় আচরণের প্রেক্ষিতে কৃষকরা যদি বা পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসলের মুখ দেখতে পায়, তার পরেও তাদের দুর্ভোগ কমে না। অধিকাংশ কৃষিজাত ফসল দ্রুত পচনশীল হওয়ায় উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তা বাজারজাত করতে হয়। কৃষিজাত ফসল সংরক্ষণের জন্য সরকারি কিছু হিমঘর রয়েছে বটে; কিন্তু সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অতি অপর্যাপ্ত। তাছাড়া যেটুকু রয়েছে তাও প্রভাবশালী মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের দখলে রয়ে যায়। সাধারণ কৃষক সমাজ এখান থেকে সেভাবে কোনোই পরিষেবা পায় না। একদিকে যেমন উপযুক্ত সংরক্ষণাগারের অভাব রয়েছে অন্যদিকে তেমনি থেকে যায় ঋণ পরিশোধ করার মহা দায়। কৃষকরা তাই ফসল ওঠা মাত্র তা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন; তা সে যত কম দামেই হোক না কেন। তাদের এই অসহায়ত্বের সুযোগ নেন মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরা। তারা একজোট হয়ে কৃষি-ফসলের সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করে দেন। তারা ওই দামের অতিরিক্ত দাম দিয়ে ফসল কিনবে না। এই অবস্থায় বেচারা কৃষক বাধ্য হন ব্যবসায়ীদের ধার্য করে দেওয়া দাম মেনে নিতে।

এর ঠিক উল্টো চিত্র রয়েছে শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে। এখানে কারখানার মালিকরা নিজেরাই তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করেন এবং প্যাকেটের উপরে লিপিবদ্ধ করে দেন নির্দিষ্ট দাম। ক্রেতারা ওই দামেই তা কিনতে বাধ্য হন। এ এক মারাত্মক বৈপরীত্য! এই বৈপরীত্যের কারণে কৃষকের দূরবস্থা আজ চরমে পৌঁছেছে। এখন যা অবস্থা তাতে উদ্দিষ্ট সংকট থেকে কৃষকের আশু মুক্তি নেই। মুক্তি সম্ভব কেবল রাষ্ট্রশক্তির প্রবল হস্তক্ষেপের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কোথায় সেই হস্তক্ষেপ! আমাদের সরকার পক্ষ বরং বিপন্ন কৃষক সমাজের কবরের গভীরতাকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য পরিকল্পনার জাল বিছিয়ে চলেছেন। প্রত্যাহৃত কৃষিবিল থেকেই তাদের এই মানসিকতা ও অবস্থান সুস্পষ্ট হয়েছে।

প্রবল প্রতিরোধ; কঠিনতম ত্যাগ শিকারের মধ্যে দিয়ে এ যাত্রায় কৃষক সমাজ কৃষিবিল থেকে আত্মরক্ষা করতে সামর্থ্য হয়েছেন বটে, কিন্তু আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই তাদের জন্য। যে কোনো সময়ে আবারও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন ওরা। এক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধান আসতে পারে যে পথে তা হল সর্বাত্মক জনসচেতনতা ও আপোষহীন প্রতিবাদ প্রবণতা। যে কোনো মূল্যে কৃষক স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রশক্তিকে সক্রিয় হতে বাধ্য করতে হবে।

এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনোরকম শৈথিল্য লক্ষ করা গেলে দিতে হবে চূড়ান্ত জবাব। কোনোরকম কোনো আপোষ করা চলবে না।

দিল্লি-আন্দোলনে কৃষক সমাজ যে জাগ্রত চেতনার পরিচয় দিয়েছেন ওই চেতনায় দীক্ষিত হতে হবে অবশিষ্ট দেশবাসীকে।

মনে রাখতে হবে কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। শক্তপোক্ত মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয় তেমনি কৃষির উন্নতি নিশ্চিত করা ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষা ব্যতিরেকে ভারতীয় অর্থনীতি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিষয়টি তাই বাঁচা মরা প্রশ্নের সমতুল। বস্তুত কৃষিক্ষেত্রের সমস্যা সমূহের সমাধান করতে পারা না পারার উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ ভারতের ভবিষ্যৎ।

আজকের বাজার অর্থনীতিতে অর্থই হল প্রথম ও প্রধান কথা। অর্থ আসে দুটি উৎস থেকে- উৎপাদন এবং পরিষেবা। তবে উৎপাদনই হল অর্থনীতির মেরুদণ্ড। পরিষেবা উৎপাদনের উপরেই নির্ভরশীল। পরিষেবা উৎপাদনের বন্টন, উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরিষেবা অর্থনীতিকে বাইরে থেকে চাকচিক্যময় করে মাত্র। পরিষেবা কোনো দেশের আর্থিক ভারকে সম্পূর্ণত ধারণ করতে পারে না। যে দেশ যথেষ্ট মাত্রায় পরিষেবা অন্য দেশে রপ্তানি করতে পারে, কেবলমাত্র সে দেশই এর উপর কিছুটা নির্ভরশীল হতে পারে। আমাদের দেশ পরিষেবা রপ্তানিকারক নয় সেভাবে: উৎপাদনই তাই আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

অর্থনীতি

কেশবের যদি অবতার হওয়ার সাধ না জাগতো

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্ম ধর্ম-আন্দোলন একদা বঙ্গদেশে অতি চর্চিত বিষয় ছিল। কিন্তু এখন তার সবই প্রায় ইতিহাস। সমাজেতিহাসের পাঠক-গবেষকদের বাইরে কেউই ব্রাহ্ম ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে সেভাবে ওয়াকিবহাল নয়। খাতায় কলমে আদি ব্রাহ্ম সমাজ, নববিধান প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে বটে; কিন্তু কার্যত তাদের কার্যকারিতা সেভাবে নেই বললেই চলে। মাঘ উৎসবের মতো বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্ম সমাজের অস্তিত্ব যা একটু অনুভব করা যায়; অন্যথায় আজকের ব্রাহ্মা সমাজ বৃহত্তর হিন্দু সমাজ-স্রোতে, ধর্ম-স্রোতেও বটে

সাইফুল্লা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

লীন হয়ে গেছে। অথচ এটা না হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। আর সেটা হলে কী ভালোই না হতো।

সহস্রাধিক বছরের যে বাঙালি জাতি-সংস্কৃতির ইতিহাস তার পটে সবচেয়ে কালো দাগ হয়ে রয়েছে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি এবং তার ফলশ্রুতিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিধবস্ত হওয়া; সর্বোপরি সাতচল্লিশের দেশভাগ; যে ক্ষত আর হয়তো কোনোদিন দূরীকৃত হওয়ার নয়। এসব কোনো কিছুই না হতে পারতো যদি না কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ওভাবে ডিরেল হয়ে যেতেন। ধর্ম-প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক পরিচয় থেকে সরে এসে সরাসরি ভগবানের অবতার হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণিত না হতেন তিনি।

সময়ের স্রোত তখন একেবারেই অনুকূলে বইছিল না বাঙালি-জাতিসত্তার সাপেক্ষে। পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাবকে পরাস্ত করে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কেবল বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা কবজা করেনি, বাঙালি জাতি-সত্তার গভীরে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সঞ্চার করে দিতেও উদগ্রীব ছিল এবং এই লক্ষ্যে বিশেষভাবে সাফল্য পাচ্ছিল তারা। তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে সেদিনের অগ্রসর হিন্দু সমাজ এতদিনের প্রতিবেশী মুসলমান সমাজকে কেবল ধনে মানে পিষ্ট করে ক্ষান্ত হননি, তাদের সঙ্গে অনতিক্রম্য প্রায় সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টিতে মনোযোগী হয়েছিলেন। সচেতন বা অসচেতন ভাবে সেদিনের অগ্রসর ব্যক্তিত্বদের সকলেই প্রায় লিপ্ত হয়েছিলেন এই মারণ খেলায়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, হিন্দু মেলার প্রবর্তন এর মতো প্রত্যক্ষ সামাজিক কৃত্যাদি থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা এমন সব ফসল ফলাচ্ছিলেন যা থেকে সম্প্রীতি চেতনা ক্রম-অপসৃত হচ্ছিল। তাদের এই সামগ্রিক কৃত্যাদির বিপরীতে দাঁড়িয়ে একান্ত অসহায়ভাবে আর্তনাদ করছিল মুসলমান সমাজ। মুসলমান সমাজের এমন নিদারুণ দুর্দিনে তাদের ও সেইসঙ্গে জাতীয় সংহতির সপক্ষে অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন যিনি তাঁর নাম কেশবচন্দ্র সেন।

তখন হিন্দু বুদ্ধিজীবী সমাজ খুব একটা ভুলের স্বর্গে বাস করছিলেন। তাঁরা মনে করছিলেন, মুসলমানদের বাদ দিয়েই সর্বাত্মক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন: উপনীত হতে পারবেন চূড়ান্ত

> **সময়ের স্রোত তখন একেবারেই অনুকূলে বইছিল না বাঙালি-জাতিসত্তার সাপেক্ষে। পলাশির যুদ্ধে বাংলার নবাবকে পরাস্ত করে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কেবল বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা কবজা করেনি, বাঙালি জাতি-সত্তার গভীরে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সঞ্চার করে দিতেও উদগ্রীব ছিল এবং এই লক্ষ্যে বিশেষভাবে সাফল্য পাচ্ছিল তারা। তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে সেদিনের অগ্রসর হিন্দু সমাজ এতদিনের প্রতিবেশী মুসলমান সমাজকে কেবল ধনে মানে পিষ্ট করে ক্ষান্ত হননি, তাদের সঙ্গে অনতিক্রম্য প্রায় সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টিতে মনোযোগী হয়েছিলেন। সচেতন বা অসচেতন ভাবে সেদিনের অগ্রসর ব্যক্তিত্বদের সকলেই প্রায় লিপ্ত হয়েছিলেন এই মারণ খেলায়।**

লক্ষ্যে। মুসলমান সমাজকে কোনোরকম ধর্তব্যের মধ্যে আনছিলেন না তারা। কিন্তু এটা যে সম্ভব নয়; দেশের অধিকাংশ মানুষকে এভাবে বাইরে রেখে যে উন্নতির শিখরে উপনীত হওয়া যায় না, তা কিছুতেই তাদের বোধের মধ্যে আসছিল না। এমন ভ্রান্তির জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে বাঙালি জাতিসত্তাকে এক আলোকিত ভবিষ্যৎ উপহার দেওয়ার জন্য প্রবল সম্ভাবনাময় ছিলেন বাবু কেশবচন্দ্র।

ব্রাহ্মধর্মীরা তখন বঙ্গদেশে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ক্রিয়াশীলতার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উন্নতির সোপান ছুঁতে যাচ্ছে ব্রাহ্ম সমাজ। এমনি এক সুদিনে ব্রাহ্ম সমাজের মুকুটে সংযুক্ত হয়েছিল আর একটি রত্ন। যুবক কেশবচন্দ্র দ্রুত পরিণত হয়েছিলেন জনপ্রিয়তম নেতাতে। ব্রাহ্ম সমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা তখন আকাশ ছোঁয়া। এই বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে কেশব বাবু যত্নশীল হলেন ব্রাহ্ম ধর্ম-সংস্কৃতিকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তখন এমনিতে ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও, একটা দিকে সমস্যা থেকেই যাচ্ছিল। হিন্দু ধর্মের সংস্কার সাধন করে, এই পথে ব্রাহ্ম সমাজকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার বাইরে অতিরিক্ত কিছু ভাবতেই পারছিলেন না নেতৃবর্গ। অর্থাৎ ব্রাহ্ম ধর্ম তখন পর্যন্ত ছিল কেবলই হিন্দু সমাজের বিষয়। মুসলমান সমাজের সঙ্গে কোনোরকম সমন্বয় তৈরি করার ভাবনা প্রশ্রয় পাচ্ছিল না ব্রাহ্ম মননে।

আর এই শূন্যস্থান পূরণেই সক্রিয় হয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। তিনি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, কেবল হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে এক সমন্বিত অবস্থান তৈরি করলেই হবে না, এর সীমানাকে আরও দূর পর্যন্ত প্রসারিত করে দিতে হবে। দেশের প্রধান প্রধান সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন তৈরি করতে হবে। আর একাজ করতে হলে প্রথমেই প্রত্যেকটি ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কিত নিবিড় পাঠ গ্রহণ করা আবশ্যক। তাই তিনি তাঁর এক একজন শিষ্যকে নিয়োজিত করেন এক একটি ধর্ম-সংস্কৃতির উপর বিস্তৃত পড়াশোনা করা ও বইপত্র লেখার জন্য। তাঁর এই পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ বসু, অঘোরনাথ গুপ্ত প্রমুখ যথাক্রমে ইসলাম, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি সমকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্ম-সংস্কৃতির চর্চায় রীতিমতো দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র সেনের দক্ষতা তো প্রশ্নাতীত ছিল। আল কুরআন এর সম্পূর্ণ অনুবাদ থেকে শুরু করে বাংলা ভাষায় ইসলামি ধর্ম চর্চার ধারায় জোয়ার এনেছিলেন তিনি। কিন্তু হায়; তাঁর শিষ্যরা যখন তাঁর নির্দেশ মতো নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছেন; নিশ্চিত করতে চলেছেন নতুন এক সূর্যের উদয়কে, তখনই ক্রমে ক্রমে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করলেন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এবং একটা সময়ের তা লক্ষনরেখাকেও ছাপিয়ে গেল।

নেতৃত্বের দৌড়ে ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় কেশবচন্দ্র তখন গুরু দেবেন্দ্রনাথকে অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছেন। এখন ব্রাহ্ম সমাজের একমেবাদ্বিতীয়ম নায়ক তিনি। তাঁর কথাই শেষকথা। তাঁর কথায় নিজেকে উৎসর্গ করতে সতত প্রস্তুত শত সহস্র যুবক-যুবতী। এমনি মাহেন্দ্র ক্ষণে মতিভ্রম হল তাঁর। নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে আখ্যাত করলেন তিনি। একটা পর্যায়ে এসে এমন কথাও বলতে শুরু করলেন, যে প্রতিরাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে তার কথোপকথন হয় এবং ঈশ্বর তার করণীয় সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে নির্দেশ দেন। এমন কি কাল তিনি কী খাবেন না খাবেন তাও নাকি তাকে বলে দেওয়া হয়।

ঘোর উন্মাদনা বলতে যা বুঝায় কেশব বাবু তখন তার স্রোতে দ্বিধাহীনভাবে ভেসে চালেছেন। এতে কোনো কিছুতেই তাঁর কোনো রকম সঙ্কোচ হচ্ছে না; এমন কি যুবতী সব মেয়েদের মাথার চুল দিয়ে নিজের পায়ের জল বা ধুলো মুছিয়ে নেওয়াতেও। এসব কিছুর পাশাপাশি বৈষয়িক বুদ্ধির শিখরে উপনীত হয়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম সংস্কৃতির মুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে হিন্দু-ধর্ম মোতাবেক নিজ কন্যাকে কোচবিহার রাজপুত্রের হস্তে সমর্পণ করা তো ছিলই।

এমন মারাত্মক বিকারের ফল ততোধিক মারাত্মক হওয়াই স্বাভাবিক এবং হলোও তাই। প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ব্রাহ্ম সমাজ ততদিনে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এখন তা আরও বিভক্ত হল। কেশবচন্দ্রের অনুসারীরা অর্থাৎ নববিধান সম্প্রদায় তাদের গুরুর এই মতিভ্রমে

সমাজ

রীতিমতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাদের একদল এর পরেও গুরুর উপর তাদের অবিচল আস্থা বজায় রেখে যেতে চাইলেন এবং অন্য দল কিছুতেই তা মেনে নিতে পারলেন না। ফলত নববিধান সম্প্রদায়ও নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে দুর্বলতর হয়ে পড়লো; আর তার সুযোগ নিল সনাতন হিন্দু ধর্মানুসারীরা। তাঁরা ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম ধর্ম-চেতনাকে মুছে ফেলে বাংলায় হিন্দু জাতীয়তাবাদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

বলা বাহুল্য মুসলমান সমাজের পক্ষে বিষয়টা মোটেই উপাদেয় হল না। তারা তাই প্রতিস্পর্ধী অবস্থানে স্থিত হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। ততদিনে মহাবিদ্রোহ উত্তর পরিবর্তিত পটভূমিতে ইংরেজ রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। এখন আর তারা হিন্দু সমাজের চাওয়া পাওয়াকে মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত নয়; বরং প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষ্যে আপোষহীন। এই আপোষহীন অবস্থানই অনিবার্য করে তুলেছিল ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও সাতচল্লিশের দেশ ভাগকে।

বাঙালি জাতীয় জীবনের এই চরম বিপর্যয়কে সেদিন হয়তো রুখে দেওয়া যেত, যদি ব্রাহ্ম ধর্ম-সম্প্রদায় তাদের গুরু কেশবচন্দ্র কর্তৃক ওভাবে বিভ্রান্ত না হতেন; অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে সহসা নিভে না যেত ব্রাহ্মা-ধর্মরূপ আলোকিত প্রদীপ খানি। বঙ্গদেশ ও বাঙালি সমাজ যে সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ধর্ম-সহিষ্ণুতা ও সামাজিক সমন্বয় ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ নেই সেখানে; আর এই মুক্তি-মন্ত্রকেই উত্তম রূপে ধারণ করা হয়েছিল কেবশচন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্রাহ্ম ধর্ম-সমাজে। বাবু কেশবচন্দ্র তাঁর সেরা সময়ে ব্রাহ্ম সভায় ইসলাম সহ অপরাপর ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনাকে নিয়মিত বিষয়ে পরিণত করেছিলেন। ব্রাহ্ম উপাসনা পদ্ধতি সহ ব্রাহ্ম সমাজের অপরাপর সব জীবনাচারে ছিল ধর্ম-সমন্বয়ের গভীর অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারের সবটাই নিঃসীম শূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছিল কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ব্যক্তিক বিচ্যুতির পথ ধরে।

কেশবচন্দ্র সেন

ও বি সি: ঘুম ভাঙছে না কিছুতেই

ও বি সি সমস্যার জল গড়িয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। নয় নয় করে কেটে যেতে চলেছে ছয় সাত মাস। সমাধান কিন্তু এখনও দূর অস্ত। এখন যা অবস্থা তাতে হাইকোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ না মিলতে পারে। তেমন হলে কী হবে বা হবে না তা সহজেই অনুমান করা চলে।

একটা সময় ছিল, যখন সরকারি চাকুরি ও প্রবল প্রতিযোগিতার সিঁড়ি ভেঙে ভর্তি হতে হয় যেসব ক্ষেত্রে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব ছিল এক শতাংশ বা তারও কম। সেখান থেকে অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছিল ও বি সি-এ শংসাপত্রের সাপেক্ষে। খাতায় কলমে ও বিসিএ-র জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকলেও তা পূর্ণ হচ্ছিল না নানা

রবিউল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা

কারণে। তবু যা পাওয়া যাচ্ছিল, তা খুব খারাপ নয়। কমবেশি সন্তুষ্টির জায়গা তো তৈরি হয়েছিলই। কিন্তু এই সন্তুষ্টির সবটাই বালির বাঁধের মতো ধ্বসে পড়ার উপক্রম এখন।

হাই কোর্টের রায়ে যে ১১২ টি সম্প্রদায়ের শংসাপত্র বাতিল হয়েছে তার মধ্যে ১০৮ টি মুসলিম সমাজভুক্ত; অন্যদিকে যে ৬৪টি সম্প্রদায়ের শংসাপত্র রক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ১২ টি মুসলিম সমাজের। তাই অবস্থা অত্যন্ত সংকট জনক।

যে ১টি মুসলিম সম্প্রদায়ের শংসাপত্র রক্ষিত হয়েছে তারা সংখ্যায় তেমন বেশি নয় এবং তারা এ রাজ্যের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। উত্তরবঙ্গের বিশেষ কয়েকটি জেলাতেই তাদের যা কিছু উপস্থিতি। এমন অবস্থায় অচিরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হবে; যেখানে এলাকা ভিত্তিক চাকুরির প্রচলন রয়েছে, যেমন আই সি ডি এস, সেখানে ও বি সির জন্য সংরক্ষিত আসনে মুসলিম সমাজের দিক থেকে আবেদনকারী থাকবে না বললেই চলে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এটা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। এখানে উক্ত ১২ টি সম্প্রদায় ভুক্ত লোকজনের উপস্থিতি প্রায় নেই। কেবল চাকুরিতে নয়। সমস্যা হবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো সব বিষয়েও। বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিছু আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে ও বি সি -এ সম্প্রদায়ের জন্য। এই সব সংরক্ষিত আসনের সবটাই অকেজো হয়ে যাবে বর্তমান অবস্থার সাপেক্ষে। এখন যা অবস্থা তাতে ও বি সি-এ সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা করে কোনো আসন সংরক্ষণ করার সুযোগ নেই। ও বি সি এ-র জন্য সংরক্ষিত ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকছে না, তা হাইকোর্টের রায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এখন এ এবং বি নিরপেক্ষভাবে কেবল ও বি সি-র জন্য মাত্র ৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকছে। এই সংরক্ষিত আসনে ও বি সি শংসাপত্রধারী কোনো মুসলিমকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে তার কোনো অমুসলিম ভাই-বোনের সঙ্গে। এমন প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফল যে অতীতে ভালো হয়নি তা আমাদের সকলেরই জানা। যেখানে অন্যদের নিযুক্ত করার সুযোগ রয়েছে সেখানে বারেবারে মুসলিমদেরকে বঞ্চিত করার ফলেই তো একটা সময়ে সংখ্যাটা ১ শতাংশেরও নিচে নেমে গিয়েছিল; যা সাচার কমিটির প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয়। এমন সংকটজনক অবস্থা থেকে মুসলিম সমাজকে হেফাজত করার জন্যই তো ও বি সি-এ এবং ও বি সি বি-র ধারণা কার্যকর করা হয়েছিল।

মুসলিমদের মধ্যে যারা ও বি সি সুবিধা প্রাপ্ত তারা মনে করছেন, এখন যেহেতু অন্যেরা প্রতিযোগিতায় নেই তাই তাদের খুব সুবিধা হবে; ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া যাবে। ব্যাপারটা কিন্তু একদমই তা নয়। ফাঁকা মাঠ পাওয়ার প্রশ্নই নেই, বরং আরও কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। মুসলমানদের জন্য এখন আলাদা করে একটি আসনও সংরক্ষিত থাকবে না। ও বি সি শংসাপত্রধারী রূপে অমুসলিমদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে তাদের।

পঞ্চায়েত নির্বাচনেও এর ব্যতিক্রম হবে না। দশ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব এখন যে উল্লেখযোগ্য মাত্রা পেয়েছে তা বজায় থাকবে না। অতঃপর কেননা পঞ্চায়েত পদপ্রার্থীদের হাতে ও বি সি বিষয়ক যে শংসাপত্র রয়েছে তার কার্যকারিতা নেই। আর যাদের শংসাপত্রের কার্যকারিতা বজায় রয়েছে তাদেরকে পূর্ব উল্লেখিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে; যেখানে তেমন সুবিধা করতে না পারা প্রায় অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক। পরিস্থিতি যখন এমন সংকটজনক তখন সামাজিক অসচেতনতা সীমা ছাড়িয়েছে। ও বি সি প্রশ্নে মুসলিম সমাজ মোটের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রথম দিকে এ ব্যাপারে যা একটু সচেতনতা লক্ষ করা যাচ্ছিল এখন তার ছিটেফোঁটাও অনুভূত হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে শহর কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন জায়গায় যে মিটিং, মিছিল ও পথসভা হয়েছে তার কোথাও জনগণের বাঁধভাঙা উপস্থিতি চোখে পড়েনি। স্থানে স্থানে তো স্বল্প উপস্থিতি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু রকমের হয়েছে। রাস্তার পাশে মাইক্রোফোন হাতে একজন বক্তা রীতিমতো গলা ফাটাচ্ছেন এবং তার সামনে বসে রয়েছেন গুটি কয়েক মানুষ; ও বি সি আন্দোলনে এমন দৃশ্য খুবই পরিচিত বিষয়।

যে ১২ টি মুসলিম সম্প্রদায়ের শংসাপত্র রক্ষিত হয়েছে তারা সংখ্যায় তেমন বেশি নয় এবং তারা এ রাজ্যের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। উত্তরবঙ্গের বিশেষ কয়েকটি জেলাতেই তাদের যা কিছু উপস্থিতি। এমন অবস্থায় অচিরেই এই পরিস্থিতি তৈরি হবে; যেখানে এলাকা ভিত্তিক চাকুরির প্রচলন রয়েছে, যেমন আই সি ডি এস, সেখানে ও বি সির জন্য সংরক্ষিত আসনে মুসলিম সমাজের দিক থেকে আবেদনকারী থাকবে না বললেই চলে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এটা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। এখানে উক্ত ১২ টি সম্প্রদায় ভুক্ত লোকজনের উপস্থিতি প্রায় নেই।

কিন্তু কেন? কেন মানুষের উপস্থিতি নেই; কেন মানুষের মধ্যে সেভাবে সাড়া ফেলছে না ও বি সি সমস্যা। একটা প্রতিবন্ধকতা রয়েছেই। ও বি সি এমন একটা সমস্যা যার গভীরতা উপলব্ধি করার জন্য একটু সহজাত শিক্ষা ও দক্ষতার আবশ্যক হয়; অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে যার অভাব রয়েছে। এই সর্বশিক্ষার যুগে পড়াশুনা করার জন্য সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়াতে তেমন কোনো সমস্যা নেই। এমন অবস্থায় ও বি সি বিষয়ক শংসাপত্রের প্রয়োজনই হচ্ছে না অধিকাংশ জনের। এদের দৌঁড় ওই স্কুল শিক্ষা পর্যন্ত। এদের মধ্যে খুব কম জনই উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে এবং চাকুরি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী হবে। কাজেই ও বি সি নিয়ে মাথাব্যথা করার কোনো দায় নেই তাদের। এর পাশাপাশি অন্যরাও তেমন গা লাগাচ্ছেন না নানা কারণে।

যারা ও বি সি-র সুবিধা প্রাপ্ত হয়ে ইতোমধ্যে চাকুরিতে বহাল হয়েছেন তারা বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন। হাই কোর্টের নির্দেশ অনুসারে তারা বিশেষ ছাড়পত্র পেয়ে গেছেন। তাদের গায়ে কোনো আঁচড় লাগছে না। কাজেই তারা নির্বিকার হয়ে রয়েছেন। কেউ কেউ আবার এই ডামাডোলের মধ্যে নিজে যে ও বি সি এ-র সুযোগ নিয়ে চাকুরি পেয়েছেন সেটাকেই যথাসম্ভব গোপন করতে চাইছেন। সব মিলিয়ে ও বি সি আন্দোলনের আকাল প্রকট হয়েছে

এবং তারপরেও কথা রয়েছে। এখন ও বি সি শংসাপত্র সমূহ বহাল থাকা যাদের জন্য খুব জরুরি সেই যে ছাত্র সমাজ, যারা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি হওয়া ও আগামী দিনে চাকুরি প্রার্থী হতে ইচ্ছুক; তারাও তো সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। তারা যদি এগিয়ে আসে তাতেই তো পথসভা বা মিটিং মিছিল সমূহে ভিড় উপচে পড়ার কথা। কিন্তু তাদের দেখা নেই বললেই চলে। ও বি সি আন্দোলনে পড়ুয়াদের এই অনুপস্থিতি সত্যিই অস্বস্তিকর; কিছুটা বিস্ময়করও বটে। হতে পারে যারা ও বি সি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা তাদেরকে সেভাবে প্রভাবিত করতে পারছেন না। তাই যদি হয় তাতেও কি পড়ুয়া সমাজ তাদের দায় মুক্ত হতে পারে। সাধারণ মানুষ ও বি সি সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি না করতেই পারেন, কিন্তু তাদের দিক থেকে তো এই সমস্যা থাকার কথা নয়। নেতৃত্বের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা তাদের জন্য শোভা পায় না। তাদের নিজেদেরই নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা। সমস্যার আগুন আগামী দিনে তাদেরকেই সবচেয়ে বেশি করে দগ্ধ করবে, তবু তারা কেন নির্বিকার।

কোনো সদুত্তর নেই। উদ্ভুত এক নিস্পৃহতা গ্রাস করেছে গোটা সমাজ-মনকে। এই নিস্পৃহতার জাল ছিঁড়ে মুসলমান সমাজকে আপাতত বার করে আনা খুব সহজ নয় বলেই মনে হচ্ছে। অধিকাংশ জনই মনে করছে, আন্দোলন যদি করতেই হবে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই করবেন; আর সে আন্দোলন যদি সফল হয় তার সুফল থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না কিছুতেই। কাজেই আপাতত নাকে তেল দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়া যেতেই পারে।

এই সর্বনাশা মানসিকতা থেকে মুসলমান সমাজের আশু মুক্তি হতে পারে যদি আত্মদীপ নামের সংগঠনটি সুপ্রিম কোর্টে নতুন করে যে মামলা করেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে ও বি সি সার্টিফিকেট ব্যবহার করে যারা চাকুরি করছে তাদের চাকুরি বাতিল করার। তাদের এই আবেদন যদি মান্যতা পায় তবে রাজ্য জুড়ে যে আগুন জ্বলবে তার উত্তাপে তপ্ত ও দগ্দ্ধ হবে অবোধ মুসলমান সমাজ। তবে তখন আর বিশেষ কিছুই করার থাকবে না। দশ বছর ধরে হাই কোর্টে ও বি সি বিষয়ক মামলা চলার সময় সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে ছিল যে মুসলমানরা এতবড় সর্বনাশের পরেও আজও তাদের ঘুম ভাঙছে না। এই ঘুম কোনো দিনও ভাঙার নয় কি।

সমাজ

প্রসঙ্গ: মাদ্রাসা শিক্ষা ও ভুতুড়ে শিক্ষক

বাংলা সমাজভাষায় ভুতুড়ে শিক্ষক শব্দবন্ধের প্রচলন হয়েছে খুব সম্প্রতি এবং দ্রুত তা আমাদের প্রবল মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত ২০১৬ সালে। কাঁথি রহমানিয়া হাই মাদ্রাসা সহ আরও কোনো কোনো মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের ডিভিশন বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। বিচারক মন্ডলীর রায়ে বলা হয়, মাদ্রাসা সমূহ যেহেতু সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান তাই এর পরিচালন ব্যবস্থায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক স্বকীয়তা থাকতে হবে।

উচ্চ ন্যায়ালয়ের এই আদেশনামাকে মান্যতা দিয়ে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করে। অতঃপর নড়েচড়ে বসেন মাদ্রাসা শিক্ষকদের একাংশ। তারা মনে করেন, এখন যা অবস্থা তাতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের অধিকার পরিচালক মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত হলে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থা তৈরি হবে; সম্ভাবনা রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে অচলবস্থা তৈরি হওয়ার। তারা তাই ওয়েস্টবেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম নামে একটি সংগঠন তৈরি করে হাই কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হন। অতঃপর দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর তাদের দাবিকে মান্যতা দেওয়া হয়; পুনর্বহাল হয় মাদ্রাস্য সার্ভিস কমিশন।

এই পর্যন্তও তেমন কোনো সমস্যা ছিল না। এরপর সমস্যা গুরুতর রূপ নেয় ঘটনাচক্রে। সরকার কর্তৃক পরিচালন সমিতির স্বপক্ষে নির্দেশনামা জারি করা হয় ৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে; আর সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক হাই কোর্টের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয় ১৩ এপ্রিল ২০১৬ তে। অর্থাৎ মাঝে ৯ দিনের ব্যবধান রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল মাঝের এই দিনগুলিতে

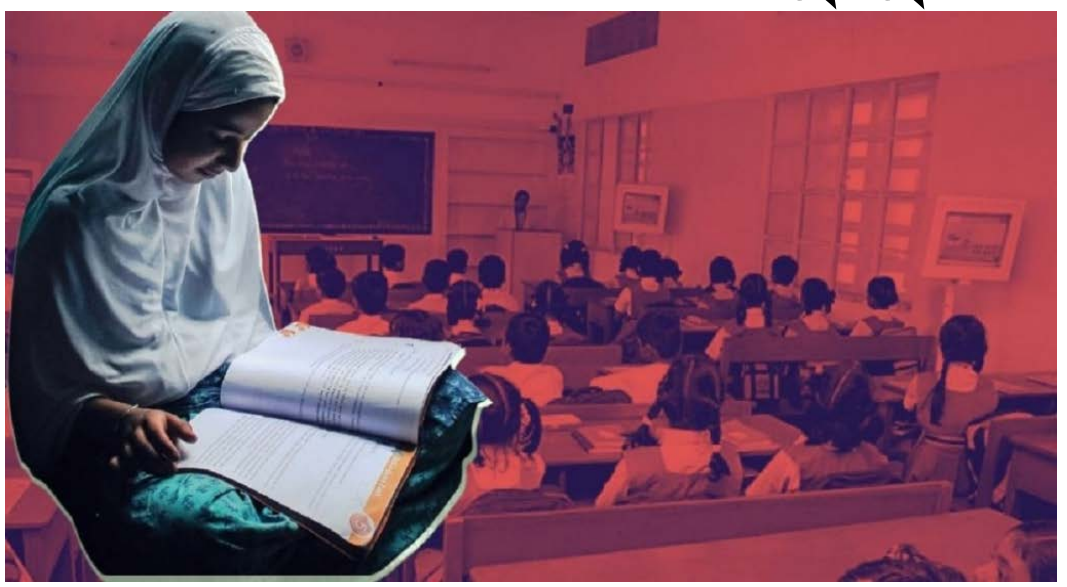

মোকলেসুর রহমান
অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির ব্যবস্থাপনায় যদি কোনো শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিযুক্ত হয়ে থাকেন তবে তাদের নিযুক্তি মান্যতা পাবে। সমস্যা হয়েছে এখানেই। এখন আইনের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে চাইছেন শত শত শিক্ষক পদপ্রার্থী। তারা দাবি করছেন, তারা অন্তবর্তীকালীন ওই সময়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন; কাজেই তাদেরকে চাকরিতে বহাল করতে হবে এবং দিতে হবে যাবতীয় প্রাপ্য। এদিকে বাস্তব ঘটনা এই যে, দাবিদার এই সব শিক্ষকদের সবাই ভুয়ো। মাত্র নয় দিনের ব্যবধানে আইন মেনে জটিল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা অসম্ভব। এরা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনামাকে কাজে লাগিয়ে অবৈধ পথে চাকরিটা কবজা করতে চাইছেন মাত্র।

তাদের এই ক্রিয়াশীলতার সূত্র ধরে নতুন করে আইনি লড়াই এর জল গড়ায় অনেক দূর পর্যন্ত। একজন প্রাক্তন বিচারপতি ও আরও তিন জন আধিকারিক সহযোগে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন সুপ্রিম কোর্ট। বলা হয়, এই তদন্ত কমিটি তদন্ত করে যে রিপোর্ট দেবেন তাই মান্যতা পাবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর কমিটি যথানিয়মে তদন্ত সম্পন্ন করে রিপোর্ট পেশ করেন এবং সে রিপোর্ট প্রত্যাশিতভাবে চাকরি প্রত্যাশীদের বিপক্ষে যায়। এদিকে তারা তাতে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তারা তাই নতুন করে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হন। অতঃপর বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন।

সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন একটি বিষয়কে ঘিরে এত মাথাব্যথা করা কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আসলে এমনিতে মাথা ব্যথা করার কিছু নেই বলে মনে হলেও কার্যত আগামীতে প্রভূত সমস্যা তৈরি হতে পারে এই সূত্রে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে যেতে পারে গভীর প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। কাজেই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেই হচ্ছে।

ঘটনা এখন যেদিকে বাঁক নিচ্ছে তাতে, সুপ্রিম কোর্টের রায় আবেদনকারী অর্থাৎ ভুতুড়ে শিক্ষকদের পক্ষে যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে শেষাবধি সংকট যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কহতব্য নয়। সেই ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রত্যেক আবেদনকারী (এখনও পর্যন্ত কমবেশি ৪০০, সংখ্যাটা শেষাবধি ২০০০ এ উপনীত হতে পারে)-কে তাদের প্রাপ্য বকেয়া অর্থাৎ এরিয়ার পরিশোধ করতে হবে। তার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে বেরিয়ে যাবে আপাতত ৩০০, পরে ৯০০ কোটি টাকা। এতে নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য হবে শিক্ষা দপ্তর। তারা তখন সমস্ত বিষয়টা খতিয়ে দেখবেন এবং প্রকৃত সত্য সামনে আসবে। তখন স্পষ্ট হবে, এইসব ভুতুড়ে শিক্ষকরা আক্ষরিক অর্থেই ভুতুড়ে। এদের কাউকেই নিয়ম মেনে নিয়োগ করা হয়নি। এরা কখনো মাদ্রাসায় আসেননি: ক্লাস নেননি। এদের যা কিছু উপস্থিতি বা অস্তিত্ব রক্ষা তার সমস্তটা কাগজে কলমে। পরিচালন সমিতি এদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভুয়ো কাগজ পত্র প্রস্তুত করে সেই অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের রায় নিজেদের পক্ষে আনতে চেয়েছেন। প্রকৃত সত্য যেদিন সামনে আসবে সেদিন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দাঁড় করানো হবে আসামীর কাঠগড়ায়। সম্ভাব্য সব মহল তখন একযোগে বলবেন, এরা এমনই: দুর্নীতি মিশে রয়েছে এদের অণুতে পরমাণুতে। কাজেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ইতি হওয়াই শ্রেয়। তাদের এই মানসিকতাকে হাতিয়ার করে একদিন প্রতিবেশী রাজ্য আসামে যেমন করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়েছে তেমনি করেই হয়তো বন্ধ করে দেওয়া হবে এ রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও। এখন কথা হল, ভুতুড়েরা যদি ভুতুড়েই হবেন তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় তাদের পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে কীভাবে। আসলে এর নেপথ্যেও রয়েছে নানা বৃত্তান্ত। যারা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা কতটা দায়বদ্ধতার পরিচয় দিচ্ছেন তা নিয়ে যথেষ্ট শংসয় রয়েছে। তাঁরা আদতে এই সব ভূতুড়েদের সঙ্গে কোনো আঁতাতে লিপ্ত হয়েছেন কিনা তা নিয়েই দেখা দিয়েছে ঘোর শংসয়। যদি ভুতুড়েদের দাবি সুপ্রিম কোর্টে মান্যতা পায়, তবে এক এক জন শিক্ষক কমবেশি পঞ্চাশ লক্ষ করে এরিয়ার পাবেন। এই বিরাট অঙ্কের টাকার অংশ বিশেষ যদি কিছু সংখ্যক দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও যারা এই কেসে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের পকেটস্থ হয় তাহলে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না; বাকি জীবনটা রাজার হালে চালিয়ে দিতে পারবেন তারা। কাজেই তারা অনেক অন্যায় করে থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সমস্যা হয়েছে মাদ্রাসা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবের কারণে। সংশ্লিষ্ট দুটি দপ্তর একে অন্যকে দোষারোপ করে নিজদেরকে দায়মুক্ত করতে চাইছেন; মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎকে হেফাজত করার দায় মাথায় তুলে নিচ্ছেন না কোনো পক্ষই।

এবং এখানেই শেষ নয়; আরও সমস্যা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের ব্যবস্থাপনায় যে তদন্ত কমিটি তৈরি হয়েছিল সেই কমিটি যে রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন তাতেও পদ্ধতিগত কমবেশি বিচ্যুতি রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দ্বিতীয়বার আবেদনকারীরা এই যে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হলেন এবং তাদের আবেদন বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হল, তার মূলে রয়েছে এই বিচ্যুতি। এমন বিচ্যুতি থেকে প্রস্তুত রিপোর্ট কে মুক্ত রাখা মোটেই কষ্টকর ছিল না, যদি আরও একটু সচেতনতার পরিচয় দেওয়া হত। তবে এখনও যে সমস্ত বিষয়টা হাতের বাইরে চলে গেছে এমন নয়। এখনও এই সমূহ সর্বনাশকে প্রতিহত করার সুযোগ রয়েছে; তবে তার জন্য উদ্যোগী হতে হবে সম্ভাব্য সব পক্ষকে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের পাশাপাশি বিশেষ দায়িত্বশীল হতে হবে যেসব মাদ্রাসাকে ঘিরে সমস্যা তৈরি হয়েছে ওই সব মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ওখানকার অধিবাসীদের। যদি কোনো শিক্ষক দিনের পর দিন, বছরের পর বছর মাদ্রাসায় আসা যাওয়া করে থাকেন; ক্লাস নিয়ে থাকেন তবে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই তাকে চিনবে, তার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারবে। কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, রীতিমতো চেনাজানা তো দূরের কথা, শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম পরিচয়ও নেই এইসব শিক্ষকদের সঙ্গে। আসলে উক্ত মহাশয় হয়তো কোনো দিন মাদ্রাসার বিল্ডিংটাও দেখেননি; তো শিক্ষার্থীরা তাকে চিনবে কীভাবে।

স্থানে স্থানে এমন হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে উক্ত ব্যক্তি যে পোস্টে চাকুরিরত রয়েছেন বলে দাবি করছেন, ওই পোস্টে একই জিও নম্বর সাপেক্ষে সম্প্রতি কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা বদলি হয়ে এসেছেন। এসব ক্ষেত্রে কী মারাত্মক সংকট তৈরি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। একটা পোস্টে তো আর দুই জন চাকরি করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে যিনি চাকরিতে বহাল রয়েছেন তাকেই বেকায়দায় পড়তে হবে; কেননা অন্য জন সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার নিয়ে আসবেন এবং তাকে আর কোথাও নিয়োগ করার কোনো সুযোগ থাকবে না। এমন অবস্থায় প্রথম জন যিনি এখন চাকুরিরত রয়েছেন তাকে আবারও অন্যত্র বদলি হতে হবে। আর তিনি যদি ওই বদলি মেনে না নেন; আদালতের দারস্থ হন তবে সমস্যা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে তার সবটা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এমনও হতে পারে; তখন আরও অনুসন্ধান হবে এবং সামগ্রিক অনুসন্ধান সূত্রে সমস্ত বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে: সকলেই বুঝতে পারবেন কোনপথে, কীভাবে, কতটা জালিয়াতি করা হয়েছে।

তেমন হলে আর কী হবে না হবে আমরা জানি না; কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা যে কালিমা লিপ্ত হবে এবং এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। কাজেই এখনও সময় আছে, সুযোগ রয়েছে যথাসাধ্য উদ্যোগী হওয়ার।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা যারা চাকরিরত রয়েছেন এবং তাদের ওই পোস্টের সাপেক্ষে ভুতুড়েরা কর্মরত থাকার দাবি করছেন, তারা যদি উদ্যোগী হয়ে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টকে অবগত করার চেষ্টা করেন তবে সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। সেক্ষেত্রে মাননীয় বিচারকমণ্ডলীর সামনে যে ধোঁয়াশা তৈরি করে রাখা হয়েছে তা কেটে যাবে; তারা যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন।

শিক্ষা

ঘটনা এখন যেদিকে বাঁক নিচ্ছে তাতে, সুপ্রিম কোর্টের রায় আবেদনকারী অর্থাৎ ভুতুড়ে শিক্ষকদের পক্ষে যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে শেষাবধি সংকট যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কহতব্য নয়। সেই ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রত্যেক আবেদনকারী (এখনও পর্যন্ত কমবেশি ৪০০, সংখ্যাটা শেষাবধি ২০০০ এ উপনীত হতে পারে)-কে তাদের প্রাপ্য বকেয়া অর্থাৎ এরিয়ার পরিশোধ করতে হবে। তার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে বেরিয়ে যাবে আপাতত ৩০০, পরে ৯০০ কোটি টাকা। এতে নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য হবে শিক্ষা দপ্তর। তারা তখন সমস্ত বিষয়টা খতিয়ে দেখবেন এবং প্রকৃত সত্য সামনে আসবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ

জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো। তাঁর চিন্তা চেতনার ব্যাপ্তি ও গভীরতার গভীরে আজও সতত তলিয়ে যাই আমরা। এমন যে নমস্য প্লেটো তিনিও কিন্তু বেশ কিছু বেফাঁস কথা বলে গেছেন। আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে কবি-সাহিত্যিকদের বিসর্জন দেওয়া তার মধ্যে অন্যতম। রিপাবলিক গ্রন্থে প্লেটো স্পষ্ট করে জানিয়েছেন-তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে কবি সাহিত্যিকদের কোনো স্থান থাকবে না; আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবি-সাহিত্যিকদের নির্বাসন দেওয়ার নিদান দিয়েছেন তিনি। নিশ্চয়ই তাঁর এই অভিমত মান্য করার নয়; তা তিনি যত বড়ো দার্শনিক হন না কেন। এখন কথা হল, অত বিজ্ঞ জন হয়েও প্লেটো মহাশয় কেন এমন বেফাঁস কথা বলতে গেলেন।

শামসুল আলম

অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক

আসলে এমনিতে অগ্রহণযোগ্য হলেও প্লেটোর এই অবস্থান কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়। আমাদের সামনে এমন কিছু কবি-সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্যকৃতির নিদর্শন রয়েছে যার সাপেক্ষে কেবলই মনে হয়; এক্ষেত্রে যদি প্লেটোর উক্ত সিদ্ধান্তকে মান্য করা হত তবে বিশেষ উপকৃত হওয়া যেত। সামাজিক বহু ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতাম আমরা। আসলে এক একটা গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিকে ঘিরে সামাজিক ক্ষতির বহর এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে যা আর পূরণ হওয়ার নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ যেমন।

রাজসিংহ বঙ্কিম প্রতিভার অনন্য উদ্ভাসন। প্রকৃতিগত ভাবে একে আখ্যায়িত করা হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ বেশ উপাদেয় বিষয়।

ঐতিহাসিক সত্যকে সাহিত্যের নিত্য সত্যে রঞ্জিত করে পরিবেশন করা হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে। এতে বিষয়টি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং রাজসিংহ-র ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু গুরুতর সমস্যা তৈরি হয়েছে অন্য জায়গায়। ঐতিহাসিক সত্যের উপর কল্পনার রঙ মেশাতে গিয়ে এখানে ঔপন্যাসিক এমন কিছু করেছেন যাতে আমাদের জাতীয় জীবনের ভারসাম্যে বড়সড় ফাটল তৈরি হয়েছে। নিরপেক্ষ ইতিহাস সম্রাট ঔরঙ্গজেবের যে পরিচয় বহন করে প্রচলিত ইতিহাস অবস্থান করে তার থেকে অনেক দূরে। আর প্রচলিত এই ইতিহাসের থেকেও শত যোজন দূরে অবস্থান করেছে রাজসিংহ। এখানে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে বললেও কম বলা হয়; ইতিহাস এখানে যেন ধর্ষিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের কলমে। প্রচলিত ইতিহাস সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অন্য অনেক নেতি সত্যের পরিচয় বহন করলেও তাঁর নৈতিক চরিত্রের উপর কালিমা লিপ্ত করেনি এতটুকুও। রাজসিংহে তাও করা হয়েছে। ঔরঙ্গজেব এখানে কামুক পুরুষ। উদিপুরীর সঙ্গে তার দাম্পত্য সুস্থতার সীমা ডিঙিয়েছে। এবং এখানেই শেষ নয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এক প্রবল অসূয়া বোধ থেকে সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য সম্ভাব্য যা কিছু করণীয় বলে মনে করেছেন তার কোনো কিছু করতেই কোনোরকম দ্বিধা করেননি। চরম বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক পুরুষকে এভাবে বিকৃত ও কালিমা লিপ্ত করা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধর্ম বিরোধী। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের শূন্যতাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যেতেই পারে। কিন্তু কল্পনার পাখা মেলে ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার বা আড়াল করা আর অনৈতিহাসিকতাকে ইতিহাসের সত্য বলে পরিবেশন করা ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্মত নয়। এটা করা হলে শৈল্পিক ও সামাজিক উভয় দিক থেকে তা দোষণীয় এবং রাজসিংহ এই দোষে দুষ্ট।

রাজপুতানার অধিপতি রাজসিংহের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ বৃত্তান্তের যে পরিচয় ইতিহাসে ধরা আছে তার কোথাও রাজসিংহের জয় ও ঔরঙ্গজেবের পরাজিত হওয়ার কথা বলা নেই। এদিকে উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবকে সম্পূর্ণত হেরো পুরুষ করে দেখান হয়েছে। তবে এহ বাহ্য। কল্পনার ফানুস ফুলিয়ে বিজয়ী পুরুষ ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত পুরুষে পরিণত করাতে মারাত্মক ক্ষতি কিছু হয়নি। ক্ষতি করা হয়েছে অন্য দিক থেকে। এখানে চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে এমন ভাবে অঙ্কন করা হয়েছে যাতে উপন্যাস যত অগ্রসর হয় পাঠকের মন-সমুদ্রে ততই ঔরঙ্গজেব বিদ্বেষের জোয়ার ওঠে। সামান্য দুই একটি ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ রাজসিংহ-তে এমন কোনো অনুষঙ্গ সংযুক্ত হয়নি যা থেকে সম্রাট ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে পাঠক-মনে সামান্য শ্রদ্ধা-ভালোবাসার মেঘ ঘনীভূত হতে পারে। এতে আহত হয় বাংলার মুসলমান মানস। উত্তর পলাশি যুদ্ধপর্বের ধ্বস্ত বাস্তবতায় তখন হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সমীকরণে অনেকটা রদবদল হয়েছে। সামাজিক যুদ্ধে ভয়ানকভাবে বিধ্বস্ত মুসলমান সমাজ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মধ্যে খুঁজে পেতে চাইছে বিশেষ আশ্রয়। তাঁর নৈতিকতা ও শুদ্ধ জীবনাচার প্রাণিত করেছে তাদেরকে।

যে ঔরঙ্গজেবের মধ্যে বাংলার মুসলমান সমাজ মানসিক আশ্রয় অন্বেষণ করছে ঔপন্যাসিক সেই ঔরঙ্গজেবকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে কালিমা লিপ্ত করেই সন্তুষ্ট হননি। তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও একেবারে পথে বসিয়ে ছেড়েছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপর্যস্ত অবস্থা হয়েছে জেবউন্নিসার। ঔরঙ্গজেব তনয়া জেবউন্নিসা অসামান্য বিদুষী কবি, ইতিহাসবিদ, রাজনীতিক প্রভৃতি সব অলংকারেই অলঙ্কৃত ছিলেন তিনি। পবিত্র আল কুরআন ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। অর্থাৎ তিনি হাফেজাও বটে। তাঁর ধর্মচেতনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা ছিল প্রশ্নাতীত। সব দিক থেকেই অনন্যা; পরম আদর্শস্থানীয়। ইতিহাসের অলিতে গলিতে কান পাতলেও বিদুষী জেবউন্নিসা সম্পর্কে কোনো রকম কোনো নেতি সত্য প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায় না। এমন যে মহীষয়ী জেবউন্নিসা ঔপন্যাসিক বঙ্কিম তাঁকে প্রবল এক কামুক নারীতে পরিণত করেছেন। পছন্দের পুরুষকে হস্তগত করার জন্য সে করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই: এমন কি পিসির সঙ্গে প্রণয় দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত। জনৈক পুরুষের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিসি রওসনারার সঙ্গে কুৎসিত প্রণয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে দেখা গেছে তাকে।

পিসির সঙ্গে ভাইজির প্রণয় দ্বন্দ্ব ভাবনা এমনিতেই কুৎসিত বিষয়; জেবউন্নিসার ও রওসনারার মতো বিদুষিণীর সাপেক্ষে তো তা আরও বীভৎস। এমন কুৎসিত, এত নোংরা একটা ভাবনা যার কলমে প্রশ্রয় পেতে পারে তাঁর মনের কদর্যতা আঁচ করে বিদুৎস্পৃষ্ট হতে হয়। কিন্তু হায়, তিনিই আমাদের সাহিত্য সম্রাট। তিনিই এমন বিকৃত মননের পসরা সাজিয়ে বসতে অভ্যস্ত যিনি আমাদের সাহিত্য-সত্যের ও সাহিত্য বিবেকের ভরকেন্দ্রে অবস্থান করছেন বলে মনে করেন অনেকেই।

রাজসিংহের শিল্প মূল্য নিয়ে বলতে গিয়ে প্রশংসার ডালি উপুড় করে দিয়েছেন সমালোচক সমাজ। আমরা আগেই বলেছি, তাঁদের এই মূল্যায়ন অযথার্থ নয়। উপন্যাস হিসেবে রাজংসিহের অসামান্যত্ব রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, শৈল্পিক এই সৌন্দর্য সৃষ্টির পাশাপাশি চরম এক বিপর্যয়কে আবাহন করা হয়েছে এখানে। বঙ্কিমচন্দ্রের দেখান পথেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় পা রেখেছেন একালের সাহিত্যিক সমাজ। এতে সর্বনাশের একশেষ হয়েছে। সূচনা পর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিরাট একটা অংশ পরিণত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার চারণ ভূমিতে। আর এই সাম্প্রদায়িকতার দহনে দগ্ধ আধুনিক বাংলা সাহিত্যই দগ্ধ করেছে বাঙালি জাতি সত্তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে।

তখন সময়টা ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বিদেশি রাজশক্তি সুপরিকল্পিতভাবে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে চলেছে; সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপে এদেশের মানুষকে তপ্ত করা তাদের ঐকান্তিক বাসনা। এই পথেই রয়েছে তাদের রাজনৈতিক সাফল্য বা ব্যর্থতা। তারা তাই বেপরোয়া। আর তাদের অমন বেপরোয়া বাসনার অনলে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন সাহিত্যিক বঙ্কিম তাঁর অসামান্য সৃষ্টি নৈপুণ্য সহযোগে। তিনি এখানে একাই একশো। যে বিষবৃক্ষ-বীজ তাঁর হাত দিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে উপ্ত হয়েছে তার থেকে আমাদের মুক্তি ঘটেনি আজও; সম্ভবত দূর ভবিষ্যতেও ঘটার নয়। অথচ এর বিপরীত কিছু হওয়া একেবারেই অস্বাভাবিক ছিল না।

জাতি-সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনকে অন্যতম প্রধান উপজীব্য করেছিলেন মধ্যযুগের বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা। তাঁদের এই ক্রিয়াশীলতার সূত্রেই প্রস্তুত হয়েছিল বাঙালি জাতির ভিত্তি। সেই ভিত্তিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সূত্রে। এদিকে এই সর্বনাশ সাধনের ঋত্বিক পুরুষকেই সর্বস্ব দিয়ে আরাধনা করছি আমরা। ওহ, প্লেটো। সেদিন যদি তোমাকে মেনে নিতাম, কী ভালোটাই না আজ হত।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপর্যস্ত অবস্থা হয়েছে জেবউন্নিসার। ঔরঙ্গজেব তনয়া জেবউন্নিসা অসামান্য বিদুষী কবি, ইতিহাসবিদ, রাজনীতিক প্রভৃতি সব অলংকারেই অলঙ্কৃত ছিলেন তিনি। পবিত্র আল কুরআন ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। অর্থাৎ তিনি হাফেজাও বটে। তাঁর ধর্মচেতনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা ছিল প্রশ্নাতীত। সব দিক থেকেই অনন্যা; পরম আদর্শস্থানীয়। ইতিহাসের অলিতে গলিতে কান পাতলেও বিদুষী জেবউন্নিসা সম্পর্কে কোনো রকম কোনো নেতি সত্য প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায় না। এমন যে মহীষয়ী জেবউন্নিসা ঔপন্যাসিক বঙ্কিম তাঁকে প্রবল এক কামুক নারীতে পরিণত করেছেন।

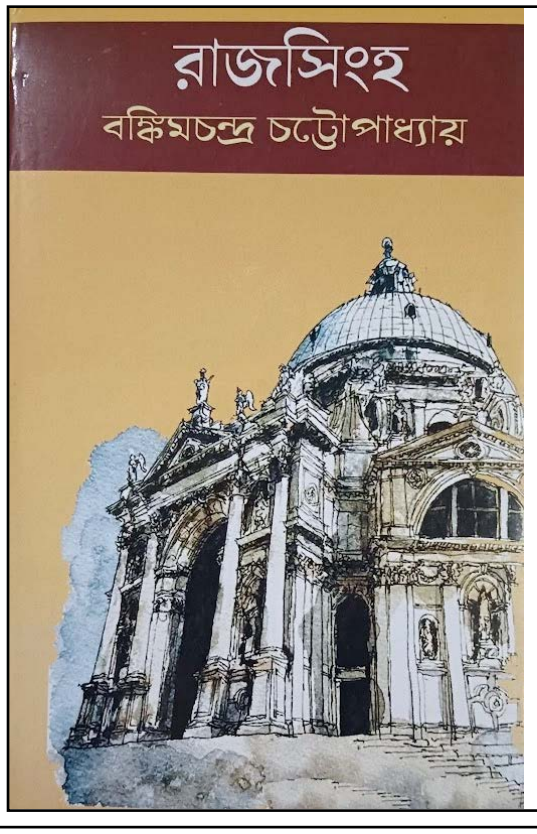

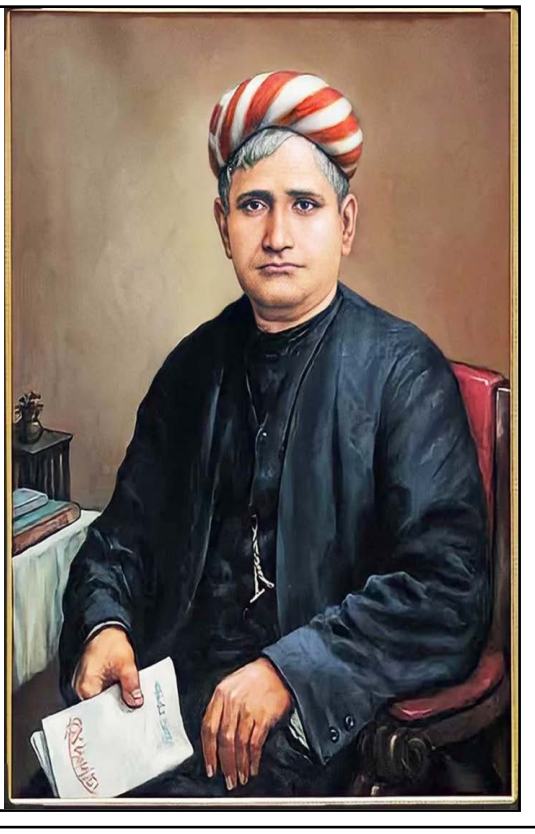

দৃষ্টি (প্রস্তাবিত) ট্রাস্টের পক্ষে মীর রেজাউল করিম কর্তৃক ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত। যোগাযোগ : ৮৯০২৪০৮৪২০, ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩২৮৮০২৪২ সম্পাদক: **সাইফুল্লা**।
On behalf of Drishti Trust, Published by Mir Rejaul Karim, Published from 38 Dr. Suresh Sarkar Road(West Block, 2nd Floor), Kolkata-700014, M: 94328800242, 86370864691, 8902408420
Email: samim.saifulla@gmail.com, rafakarimnbu@gmail.com **Editor: SAIFULLA**